সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

অনুবাদ • সৌরীন নাগ

ফ্রয়েড সাহেব আস্তিক ছিলেন না; তাহার বিবেচনায় ধর্মবিশ্বাস একরূপ মনোবিকলন, মানুষের পরিপক্কতা অর্জন ও জ্ঞান-অন্বেষণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং মুসার নবীত্বে তাহার বিশ্বাস থাকিবার প্রশ্ন উঠে না। তাহার অনুসন্ধিৎসা কিছুটা ভিন্ন হইবারই কথা। *মুসা নবী এবং একেশ্বরবাদ* নামীয় গ্রন্থটিতে তাহার উদ্দেশ্য ঠিক কী সহসা স্পষ্ট হয় না। তবে শুরুতে তিনি স্বীয় কায়দায় মুসা নবীর ঠিকুজি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে মুসা নবী আদৌ বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নহেন। বরং তিনি মিশরীয় বংশোদ্ভূত, মিশরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ভাগ্যবিড়ম্বিত সন্তান। নিছক পৌরাণিক কাহিনীর বিবর্তনে তিনি ইহুদি পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

তাহার দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল : মুসা নবী আল্লাহর ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেন নাই; বরং পূর্বপ্রচলিত ইখনাতনের ধর্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। অতএব, তাহার প্রতি ভক্তিতে আনত হইবার বিশেষ কোনো কারণ ইহুদি সম্প্রদায়ের থাকিতে পারে না।

সাতকাহনে বইয়ের পাতার সংখ্যা বাড়িলেও ফ্রয়েড সাহেব কার্যত এমন কিছুই বলিতে পারেন নাই যে ইহুদিরা মুসা নবীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। বরং মুসা নবী যে একটি ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, কাল্পনিক কোনো চরিত্র নহেন, এই বক্তব্যটি প্রকারান্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছে। অবচেতনের রাজাধিরাজ ফ্রয়েড সাহেবের অবচেতনে লক্ষ্য হয়তো তাহাই ছিল। ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও জন্মসূত্রে তিনি নিজেও ইহুদি; মুসা নবী সম্পর্কে তাহার কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

–ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, *দৈনিক প্রথম আলো*

ISBN 984 70209 0055 9

MOSES
AND MONOTHEISM

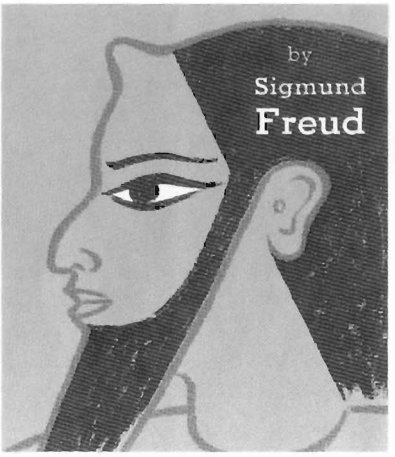

"একটা জাতি যাকে জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান বলে প্রশংসা করে, সেই মানুষকে জাতির কাছে অস্বীকার করা, এটা মোটেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না— বিশেষ করে সেই জাতিরই আরেকজনের পক্ষে," সিগমুন্ড ফ্রয়েড লিখছেন, যখন তিনি মোজেস ও একেশ্বরবাদ বইতে সেই মহান অনুশাসন-দাতার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিচ্ছেন। এই বইয়ে, যেটি তাঁর শেষ বই, ফ্রয়েড যুক্তি দিচ্ছেন যে, মোজেস ছিলেন একজন ইজিপ্‌শিয়ান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ইহুদি ধর্মটা আসলে প্যালেস্টাইনে ইজিপ্‌শিয়ান রপ্তানি। ফ্রয়েড আরও লিখছেন যে, মোজেসকে সেই উষর প্রান্তরে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা ছিল পিতার বিরুদ্ধে আদিমতম অপরাধের পুনরাভিনয়; দীর্ঘকাল বয়ে চলা এই অপরাধই, ফ্রয়েড বলছেন, খ্রিস্টানদের যিশুর মৃত্যুকে আত্মোৎসর্গ বলে মনে করার কারণ। "ত্রাণকর্তাই হচ্ছেন সেই প্রধান অপরাধী, ভ্রাতৃ-সংঘের নেতা, যিনি পিতাকে পরাভূত করেছিলেন।" এটাই হচ্ছে জুডাইজম ও ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে মূল পার্থক্য। "জুডাইজম ছিল পিতার ধর্ম, ক্রিশ্চিয়ানিটি হয়ে দাঁড়াল পুত্রের ধর্ম।" ফ্রয়েড-এর যুক্তি-তর্ক অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ, বাস্তব এবং উদ্ভট-কল্পনার মধ্যে তাঁর করা পার্থক্য, যেমন সব সময়েই হয়, অত্যন্ত শিথিল। যদি উল্টোপাল্টা চিন্তাভাবনার ফসল হিসাবে এটা পড়া যায়, তাহলে অবশ্য তাদের কাছে এটা আকর্ষণীয় মনে হবে, যারা খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো খুঁজে পেতে চায়।

—মাইকেল যোশেফ গ্রস

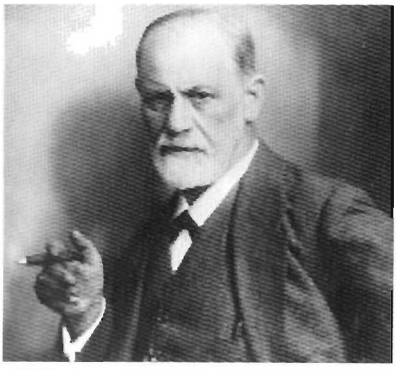

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ৬ মে ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রয়েড মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত ইতিহাস বর্ণনার ওপর একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি যে সমস্ত বিষয়ের ওপর গবেষণামূলক পর্যালোচনা করেছেন, সেগুলি উচ্চ-পর্যায়ের সাহিত্যের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত। মনস্তত্ত্ব-কে বিজ্ঞানের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার তাঁর যে প্রচেষ্টা— তার দ্বারা তিনি মনোবিশ্লেষণের একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের ব্যক্তিত্বের ধারণাই বদলে দিয়েছে। ফ্রয়েড একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক; তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে মানব চরিত্র নিয়ে একটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাশীল মনীষীদের একজন বলে চিরকাল সমাদৃত হবেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : সৌরীন নাগ কবিতা, ছড়া এবং গান লেখেন। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায়। দেশ ছেড়েছেন অনেক ছোটবেলায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় বাস করেন। অপরাধ ও দুর্নীতি দমন পেশায় কেটেছে কর্মজীবন। বেশ কয়টি বই অনুবাদ করেছেন। ভারতের আগরতলার একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং বাংলাদেশের বুক ক্লাব, শৈশব ও সন্দেশ থেকে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

Der Mann Moses und die monotheistische

(Moses and Monotheism)

Sigmund Freud

সিগমুন্ড ফ্রয়েড

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

সন্দেশ

সন্দেশ
ISBN-978-984-8088-32-6

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

মূল : সিগমুন্ড ফ্রয়েড

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

Der Mann Moses und die monotheistische by Sigmund Freud

Copyright © 1939 by Sigmund Fraued, 1967 by Ernst L. Fraued and Anna Fraued
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১১

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
টৈকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৬৮.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

অনুজপ্রতিম, অগ্রণী লেখক ও অনুবাদক শ্রী চুনিলাল মুখোপাধ্যায়-কে,
যার অদম্য উৎসাহ ও নিরন্তর প্রেরণা আমার লেখনীকে
সচল রেখেছে এবং প্রকাশকের ও পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে

অনুবাদকের আরো বইঃ

স্রষ্টার ইতিবৃত্ত / মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং
এক বুড়ো আর সমুদ্র / মূল : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
পিনোক্কিও / মূল : কার্লো কলোদি
ইস্তাম্বুল : একটি শহরের স্মৃতিচারণ / মূল : ওরহান পামুক
ক্ষুধা / মূল : ন্যুট হ্যামসুন
সব পেয়েছির বই / মূল : গাস কুইজার
বাইবেল / মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং
সুইস পরিবার রবিনসন্ / জোহান ডেভিড্ উইস্
টলস্টয়ের ছোটদের গল্প / মূল : লিও টলস্টয়
একটু আলোর জন্য (কাব্যগ্রন্থ)

অনুবাদকের কথা

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্-এর এই বইটির ১ম ও ২য় পর্ব জার্মানির ইমাগো পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। ৩য় পর্ব এর আগে ছাপার অক্ষরে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। জার্মান ভাষা থেকে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন শ্রীমতী ক্যাথেরিন জোন্স্। আমাদের সৌভাগ্য যে, সেই ইংরেজিতে অনুবাদের সময় অনুবাদিকা স্বয়ং সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছিলেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলিতে যথাযথ পরিভাষা খুঁজতে বেগ পেতে হয়েছিল। সংসদের ইংরাজি-বাংলা অভিধানটি এব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তা সত্ত্বেও এই অতি কঠিন, প্রায় দুর্ভেদ্য, বিষয় এবং ভাষায় প্রকাশ দুটোতেই, রচনাটিকে বশে আনতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। রচনাশৈলীতে সর্বত্র হয়ত মসৃণতা আনা যায়নি। বাক্য বিন্যাসে কোথাও কোথাও খটমট ভাবটা থেকে গিয়েছে। সেটা আমার ত্রুটি, বিষয়ের বা লেখকের নয়। পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন। আর এ ব্যাপারে কারো কোনো সহৃদয় মতামত, উপদেশ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব এবং তদনুযায়ী পরবর্তী সংস্করণে যথাযোগ্য সংশোধন/পরিবর্তন করা যেতে পারে।

এই কঠিন বইটির বাংলায় ভাষান্তরণের গুরুভার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে প্রকাশক লুৎফর রহমান চৌধুরী আমার সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার জন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

সৌরীন নাগ

সূচিপত্র

১ম পর্ব : মোজেস, একজন ইজিপ্‌শিয়ান ◆ ১৩
২য় পর্ব : যদি মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান হন ◆ ২২
৩য় পর্ব : মোজেস, তাঁর অনুগামীদল এবং একেশ্বরবাদী ধর্ম ◆ ৫৪

প্রারম্ভিক টীকা

১ম পরিচ্ছেদ : ◆ ৫৮-৯৮

১. ঐতিহাসিক সূত্রগুলি ◆ ৫৮
২. সুপ্তিসময়কাল এবং ঐতিহ্য ◆ ৬৫
৩. সাদৃশ্য ◆ ৭০
৪. প্রয়োগ ◆ ৭৮
৫. প্রতিবন্ধকগুলি ◆ ৮৯

২য় পরিচ্ছেদ : ◆ ৯৯-১২৬

১. সারাংশ ◆ ৯৯
২. ইস্‌রায়েলের লোকেরা ◆ ১০০
৩. মহান ব্যক্তি ◆ ১০১
৪. আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ◆ ১০৫
৫. পরিত্যাগ বনাম চরিতার্থতা ◆ ১০৮
৬. ধর্মের মধ্যে সত্য ◆ ১১৪
৭. অবদমিতের প্রত্যাবর্তন ◆ ১১৬
৮. ঐতিহাসিক সত্য ◆ ১১৮
৯. ঐতিহাসিক বিকাশ ◆ ১২২

মোজেস ও একেশ্বরবাদ

১ম পর্ব : মোজেস, একজন ইজিপ্‌শিয়ান

একটি মানুষকে একটি জাতি যদি তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনে করে, সেটা অস্বীকার করাটা খুব হাল্কাভাবে মোটেই নেওয়া যায় না– বিশেষ করে সেই জাতিরই একজনের পক্ষে। তবুও বলব, কোনো বিচার বিবেচনাই আমাকে তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে সত্যকে একপাশে সরিয়ে রাখার জন্যে বাধ্য করতে পারবে না। আরো বেশি করে এইজন্যে যে, এই সমস্যার সাদা সত্যকে ব্যাখ্যা করলে এই যে ব্যাপারের সঙ্গে তারা জড়িত, তার পরিপ্রেক্ষিতের ওপর আমাদের অর্ন্তদৃষ্টিকে গভীরে নিয়ে যাবার আশা করতে পারব।

এই যে মানুষটির কথা বলা হচ্ছে, মোজেস, তার জাতির মুক্তিদাতা, যে তাদের ধর্ম এবং তার অনুশাসন দিয়েছিল, সে এত দুরের একটা সময়ের কথা যে, প্রথমে একটা প্রশ্ন উঠে আসে, সে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিল, নাকি একটা কাহিনী-চরিত্র। যদি সে সত্যিই থাকত, তাহলে তার সময় ছিল সম্ভবতঃ খ্রিস্টপূর্ব তেরোশো বা চোদ্দশো শতাব্দী; শুধু পবিত্র গ্রন্থগুলো আর ইহুদিদের লিখিত প্রথাগুলোর বাইরে তার কোনো উল্লেখ আমরা পাই না। যদিও এই সিদ্ধান্ত চরম ঐতিহাসিক নিশ্চয়তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে না, তবু ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মত এই যে, মোজেস নামে একটি ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল, এবং ইজিপ্ট থেকে দলবদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণে সে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সঠিক কারণ সহকারে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, ইস্‌রায়েলের পরবর্তী ইতিহাসকে সঠিক বোঝা যাবেনা, যদি না এই সত্যটাকে স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞান এখন যথেষ্ট সাবধানী হয়েছে, আর এখন প্রচলিত রীতিগুলোকে উদারভাবে দেখে, ঐতিহাসিক তদন্তের আগের দিনগুলোর মতো নয়।

মোজেস সম্বন্ধে প্রথমেই যে ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল তার নাম, যেটা হিব্রু ভাষায় 'মোজসে' লেখা হয়। জিজ্ঞাসা করাই যেতে পারে যে, এই নামটা কোথা থেকে এসেছে? এর মানে কী? এটা কিন্তু জানা আছে যে, 'এক্সোডাস' অধ্যায় ২-এর গল্পটিতে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। সেখান থেকে আমরা

জানতে পারি যে, যে ইজিপ্‌শিয়ান রাজকুমারী নীল নদের জল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনিই নামটি দিয়েছিলেন আর তার সাথে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা এই রকম দিয়েছিলেন : কারণ আমি ওকে জল থেকে তুলে এনেছি। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট নয়। "নামটির বাইবেল প্রদত্ত ব্যাখ্যা : যাকে জল থেকে তুলে আনা হয়েছে"– এইভাবে 'জুডিসে লেক্সিকন'-এর একজন লেখক বলছেন, "লোকায়ত শব্দ প্রকরণ; নামটির সক্রিয় হিব্রু রূপ (মোজেস নামটি বড় জোর "তুলে আনা" বোঝাতে পারে) এই সমাধানের সঙ্গে মেলানো যায় না।" এই যুক্তি আরো দুটো বিবেচনা দ্বারা সমর্থন করা যেতে পারে : প্রথমত একজন ইজিপ্‌শিয়ান রাজকুমারী হিব্রু ভাষার শব্দতত্ত্ব জানবেন, এটা একেবারে অবাস্তব ব্যাপার, আর দ্বিতীয়ত, যে জল থেকে শিশুটিকে তোলা হয়েছিল, তা খুব সম্ভবত নীল নদের জল নয়।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে বহু লোকের বক্তব্য এই ছিল যে, মোজেস নামটা ইজিপ্‌শিয়ান শব্দ ভান্ডার থেকেই এসেছে। এই মতের অনুকূলে যত লেখক আছেন, তাদের সকলের কথা না বলে, আমি 'ব্রেস্‌টেড', একজন লেখক, যাঁর 'ইজিপ্টের ইতিহাস' বইটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, তাঁর একটি সাম্প্রতিক লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, "এটা লক্ষ করা জরুরী যে, তার এই মোজেস নামটা ইজিপ্‌শিয়ান। এটা একেবারে সরল একটা ইজিপ্‌শিয়ান শব্দ 'মোজ,' যার মানে হচ্ছে 'শিশু,' এবং এইরকম সম্পূর্ণ নামেরই একটা সংক্ষেপিত রূপ, যেমন অ্যামোন-মোজ', অর্থাৎ অ্যামোন-একটি-শিশু,' অথবা 'পতা-মোজ,' অর্থাৎ 'পতা-একটি শিশু,' আবার এই শব্দগুলোও আরো সম্পূর্ণ নামের সংক্ষেপিত রূপ, যেমন 'অ্যামোন (দিয়েছে)-একটি-শিশু', অথবা 'পতা (দিয়েছে)-একটি-শিশু'। এই খটোমটো সম্পূর্ণ নামটার একটা সুবিধাজনক, চট্‌জলদি বলা যায়, এমন একটা সংক্ষেপিত রূপ হল 'মোজ'-'শিশু' এবং ইজিপ্‌শিয়ান স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে এই নামটা প্রায়ই দেখা যায়। মোজেসের বাবা নিঃসন্দেহে তার ছেলের নামের আগে একটা ইজিপ্‌শিয়ান দেবতার নাম, যেমন, 'অ্যামোন', বা পতা যোগ করেছিলেন, কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোনো সময়ে এই দেবতার নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং শিশুটিকে সকলেই শুধু 'মোজ' বলে ডাকতে থাকে। (নামের শেষের 'এস'-টি ওল্ড টেস্টামেন্ট এর গ্রিক অনুবাদের থেকে নেওয়া। এটা হিব্রুতে নেই, সেখানে আছে 'মোসেহ্')।" আমি এই উদ্ধৃতিটা হুবহু তুলে দিলাম আর এই ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমি কেবল একটু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, ব্রেস্‌টেড এই ধরণের নামগুলো লেখার সময় ইজিপ্‌শিয়ান রাজাদের অনুরূপ নামগুলো উল্লেখ করেননি, যেমন, আহ-মোজ, থুৎ-মোজ (থোত্‌মেস) এবং রা-মোস (রামসেস)।

এটা আশা করা যায় যে, এই অসংখ্য লেখকদের মধ্যে অন্তত: একজন লেখক মোজেস নামটা ইজিপ্‌শিয়ান নাম বলে চিনতে পারার পর, এই উপসংহারে আসতে পারতেন, অথবা অন্তত: এই সম্ভাবনাটাও বিবেচনা করতে পারতেন যে,

ইজিপ্‌শিয়ান নামধারী মানুষটা নিজেও ইজিপ্‌শিয়ানই হবে। আধুনিক যুগে, এ ধরণের সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক নয়, যদিও আজকের দিনে একটা লোকের একটা নয়, দু'দুটো নাম থাকে এবং যদিও নাম পরিবর্তন কিংবা নতুন পরিস্থিতিতে নামটির অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়াটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই, আমরা মোটেই অবাক হই না, যখন দেখি, কবি শ্যামিসো আসলে ফরাসি বংশোদ্ভূত, অন্যদিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আসলে ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত, এবং বেঞ্জামিন ডিস্‌রায়েলি ছিলেন একজন ইতালিয়ান ইহুদি, ওঁর নামটাতেই একথা মনে হয়। সেই আদিম যুগে নাম থেকে জাতি নিরূপণ করাটা খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রামাণ্য ছিল। যাই হোক, আমার জ্ঞানমতে, কোনো ঐতিহাসিকই মোজেসের ক্ষেত্রে এই উপসংহারে আসেননি, এমন কি ওদের মধ্যে একজনও, ব্রেস্‌টেড-এর মতো, মোজেস যে "ইজিপ্‌শিয়ানদের সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেছিলেন," তা-ও বিশ্বাস করতে তৈরি ছিলেন না।

ওরা কেন এ কাজ করেননি, তা অনুমান করা যায়। হয়তো বাইবেল-উল্লিখিত ঐতিহ্যের প্রতি যে ভীতি, তা অনতিক্রম্য ছিল। হয়তো মোজেস মানুষটি হিব্রু ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন, এ ধরনের কল্পনাও অবিশ্বাস্য ছিল। যেটাই হোক, যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই যে, মোজেস মানুষটির উৎস বিচার করতে গেলে, নামটি যে ইজিপ্‌শিয়ান সেটি কোনো কারণ হতে পারে না এবং এর চেয়ে বেশি আর কিছু এ থেকে পাওয়া যাবে না। যদি এই মহান ব্যক্তিটির জাতীয়তার প্রশ্নটিকে জরুরী মনে করা হয়, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে যে কোনো নতুন তথ্যই সাদরে গৃহীত হবে।

আমার এই ছোট প্রবন্ধে আমি সেই চেষ্টাই করেছি। এটি হবে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এর মাধ্যমে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছব, সেটি যে অল্পসংখ্যক পাঠক বৈশ্লেষিক যুক্তিবাদের সঙ্গে পরিচিত, তাদের প্রভাবিত করবে এবং তারা এই সিদ্ধান্তের মর্মোপলব্ধি করতে পারবেন। আশা করি, তাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে।

১৯০৯ সালে, অটো র‍্যাঙ্ক, তখনও আমার দ্বারা প্রভাবিত এবং আমারই পরামর্শে একটা বই প্রকাশ করে, নাম : দের্ মিথাস্ ভন্ দের্ গিবার্ট দেস্ হেল্ডেন। এটিতে এই বিষয়টি আছে যে, "প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সভ্যজাতি তাদের নায়কদের, পৌরাণিক রাজা ও রাজকুমারদের, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদের, রাজবংশ, সাম্রাজ্য ও শহরের প্রতিষ্ঠাতাদের, এক কথায় তাদের জাতীয় নায়কদের চারপাশে একটা পৌরাণিক অলৌকিকত্বের কাহিনী তৈরি করেছিল, কবিতায়, গাথায়, তাদের মহিমা প্রচার করেছিল। বিশেষ করে তাদের জন্ম এবং প্রথম বয়সের বৃত্তান্তের মধ্যে অনেক উদ্ভট বৈশিষ্ট্যের কথা ঢুকিয়েছিল। এই সব গল্পগুলোর বিস্ময়কর সাদৃশ্য, না, আক্ষরিক অভিন্নতা, যদিও সেগুলো আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য জাতির, কখনও একজাতি আর এক জাতির থেকে বিশাল

ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থিত, সম্পর্কে প্রচলিত, সেই গল্পগুলি সকলেরই জানা এবং অনেক তদন্তকারীকেই নাড়া দিয়েছিল।"

র‍্যাঙ্ককে অনুসরণ করে আমরা গ্যান্টনের রীতিতে পুনর্নির্মাণ করতে পারি– একটি গড়পড়তা পৌরাণিক কাহিনী যা এইসব গল্পের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে আনতে পারবে এবং তখন আমরা এই সূত্র পেয়ে যাব :

"নায়ক হচ্ছে সমাজের সর্বোচ্চ ধাপের পিতামাতার পুত্র, প্রায়শঃই রাজার পুত্র।" তার মায়ের গর্ভাধানে বহু বাধাবিপত্তি এসেছে, যেমন মিতাচারিতা, অস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব; অথবা তার পিতামাতা কোনো নিষেধাজ্ঞার জন্য বা কোনো বাহ্যিক বাধার জন্য গোপনে সহবাস করেছিলেন। তার মায়ের গর্ভাবস্থায় বা তার আগে কোনো দৈববাণী হয়েছিল বা স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে পিতাকে সাবধান করা হয়েছে যে, সন্তানের জন্ম তার নিরাপত্তাকে সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত করবে।

"ফলস্বরূপ পিতা (বা পিতার প্রতিনিধিরূপে অন্য কোনো ব্যক্তি) নবজাত শিশুকে হত্যা করবার বা সাংঘাতিক বিপদের মুখে ফেলে দেবার আদেশ দেবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শিশুটিকে একটা ঝুড়িতে ভরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

"শিশুটিকে তারপর কোনো পশু বা দরিদ্র ব্যক্তি, যেমন পশুপালক ইত্যাদি, উদ্ধার করে বাঁচাবে এবং কোনো স্ত্রী পশু বা নীচ ঘরের স্ত্রীলোক বক্ষদুগ্ধ পান করাবে।

"শিশুটি যখন বড় হবে, তখন সে তার অভিজাত পিতামাতাকে, অনেক দু:সাহসিক অভিযান শেষে, পুনরাবিষ্কার করবে, পিতার ওপর প্রতিশোধ নেবে এবং তার দেশের লোক তার সত্য পরিচয় পাবে এবং শেষকালে সে যশ ও মহানতা প্রাপ্ত হবে।"

সবচেয়ে দূর অতীতের যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই পৌরাণিক কাহিনী মেলে, তিনি হলেন, অ্যাগেড্-এর সারগন, ২৮০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে যিনি ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের যে ব্যাপারে আগ্রহ, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এই ব্যক্তির নিজের বর্ণনাটা উদ্ধৃত করা ভালো :

"আমি সারগন, মহান রাজা, অ্যাগেড এর রাজা। আমার মা ছিলেন দিব্য কুমারী; আমার বাবা কে আমি জানতাম না; আমার বাবার ভাই পাহাড়ে বসবাস করতেন। আমার শহর আজুপিরানিতে– ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে অবস্থিত– আমার মা দিব্যকুমারীর গর্ভে আমি এসেছিলাম। তিনি গোপনে আমার জন্ম দেন। তিনি শরগাছ দিয়ে বোনা একটা ঝুড়িতে আমাকে রেখে ঝুড়ির ঢাক্‌নাটা পিচ্ দিয়ে বন্ধ করে, আমাকে জলে ভাসিয়ে দেন। স্রোত আমাকে ডুবিয়ে নিতে পারেনি, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আক্কির কাছে, যে ভারী, জল তোলে। আক্কি একজন সহৃদয় মানুষ, আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে নিজের

ছেলের মতো আমাকে মানুষ করে এবং বড় করে তোলে। আক্কি আমাকে তার মালী বানায়; যখন আমি মালীর কাজ করতাম, ইস্তার আমার প্রেমে পড়ে। আমি তারপর রাজা হলাম আর পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছি।"

এই পর্যায়ের সবচেয়ে পরিচিত নামগুলো হল, অ্যাগেড্-এর সারগণ– এর পরেই মোজেস, সাইরাস এবং রোমুলাস। এদের ছাড়াও, র‍্যাঙ্ক আরো অনেক নায়ককে এই ধরণের পৌরাণিক কাহিনী বা গাথায় বর্ণিত হয়েছে বলে লিখেছেন, যাদের জীবনেও এই গল্প, হয় পুরোটা না হয়, বোঝা যায় এমন অংশ রয়েছে, যেমন ঈডিপাস, কর্ণ, প্যারিস, টেলিফোস, পার্সিউস, হেরাক্‌ল্‌স, গিল্‌গামেশ, অ্যাক্সিয়ন, জেথোস এবং আরো অন্যান্য।

র‍্যাঙ্কের লেখা থেকে এই রকম পৌরাণিক কাহিনীর উৎস এবং তাদের প্রবণতা কী, তা আমাদের জানা। আমি শুধু কতকগুলো ছোট ছোট ইঙ্গিত দিয়ে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলব। একজন নায়ক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার পিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত পিতাকে পরাজিত করে। পৌরাণিক কাহিনী নায়কের জীবনের শুরু থেকেই এই লড়াই এর কথা বলে, যখন তার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার জন্ম হয় এবং পিতার অশুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও তার জীবন রক্ষা হয়। ঝুড়ির মধ্যে থাকাটা, শিশু জন্মানোর একটা পরিষ্কার প্রতীক; ঝুড়িটা হচ্ছে গর্ভাশয়, স্রোত হচ্ছে জন্মানোর সময় বহির্গত জল। অগুনতি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে শিশুটির তার পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক বোঝানো হয়, তাকে জল থেকে তোলা বা রক্ষা করার ব্যাপারটা থেকে। যখন কোনো জাতির কল্পনায় এই কাহিনী কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে জড়ানো হয়, তার অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তিকে নায়ক হিসেবে পরিচিতি দেওয়া এবং তার জীবন যে সেই আদর্শ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেছে, তার স্বীকৃতি দেওয়া। এই পৌরাণিক কাহিনীর ভেতরের উৎস হচ্ছে শিশুটির তথাকথিত "পারিবারিক অতিপ্রাকৃত কাহিনী, যাতে শিশুটি তার পিতামাতার সঙ্গে পরিবর্তিত সম্পর্কের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করে, বিশেষ করে তার পিতার সম্পর্কে। শিশুটির জীবনের প্রথম বছরগুলো তার পিতা সম্পর্কে আড়ম্বরপূর্ণ অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দ্বারা পরিচালিত হয়। স্বপ্নের মধ্যে রাজা ও রাণী, পরীর গল্প ইত্যাদি সর্বদাই পিতামাতাকে বোঝায়। পরবর্তীকালে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বাস্তব হতাশার প্রভাবে পিতামাতার কাছ থেকে মুক্তি এবং পিতার প্রতি একটা চরম মনোভাবের উদয় হয়। কাহিনীর দুটি পরিবার, একটা উচ্চবংশীয় আর একটা নিম্নবংশীয়, আসলে তার নিজের পরিবারেরই প্রতিরূপ, যেটা শিশুটির কাছে তার জীবনে ধাপে ধাপে প্রতিভাত হয়।

নায়কের জন্মের এই পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্য এবং বহু-দূর বিস্তৃতি আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আরো বেশী আকর্ষণীয়

হচ্ছে মোজেসের জন্ম কাহিনী, কারণ এই কাহিনী অন্য অনুরূপ কাহিনীর চাইতে আলাদা; এমনকি একটা বিশেষ জায়গায় এই কাহিনী অন্য কাহিনীগুলোর বিরোধিতা করে।

আমরা শুরু করব, দুটো পরিবার দিয়ে যাদের মধ্যে এই পৌরাণিক কাহিনী শিশুটির ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। আমরা জানি যে, বৈশ্লেষিক ব্যাখ্যায় এই দুই পরিবারকে একটিই পরিবার বলে ভাবা হয়, তফাৎটা শুধু সময়গত। এই পৌরাণিক কাহিনীর আদর্শ রূপ হচ্ছে, প্রথম পরিবারটি, যেখানে শিশুটির জন্ম, সেটি একটি মহান পরিবার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজপরিবার; দ্বিতীয় পরিবারটি, যেখানে শিশুটি বেড়ে উঠেছে, একটি নিচু, মর্যাদাহীন পরিবার। কেবল ঈডিপাসের গল্পে এই তফাৎটা অস্পষ্ট। একটি রাজপরিবার শিশুটিকে পরিত্যাগ করেছিল আর, অন্য একটি রাজ-দম্পতি শিশুটিকে মানুষ করেছিল। এই একটি মাত্র উদাহরণে, পৌরাণিক কাহিনীটার মধ্যেই যে দুটো পরিবারের আসল পরিচয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, এটা মোটেই কোনো দুর্ঘটনা নয়। দুটি পরিবারের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য যে মহান ব্যক্তিটির নায়কোচিত চরিত্র বিধৃত করছে-তাতে আমাদের এই কাহিনীর একটি দ্বিতীয় ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে, যেটা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নায়ককে মহানতা দান করে তাকে একটা উচ্চতর সামাজিক পদমর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারেও কাহিনীর এই ধর্মকে ব্যবহার করা যায়। কাজেই যে সাইরাস মেডেস-দের কাছে একজন পরদেশী বিজেতা, সেই এই কাহিনীর দৌলতে, তাদের রাজার পৌত্র হয়ে যায়। রমুলাস-এর কাহিনীতেও সাদৃশ্য রয়েছে। যদি এরকম কোনো ব্যক্তি কখনও থেকেও থাকে, তাহলে সে অবশ্যই একজন অপরিচিত অভিযানকারী, একজন ভুইফোঁড় লোক হবে; অথচ পৌরাণিক কাহিনী তাকে অ্যাল্‌বা লঙ্গা-র রাজবাড়ির সন্তান এবং উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছে।

মোজেস-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রথম পরিবারটি– সাধারণত খুব বিশিষ্ট– এখানে যথেষ্ট নম্র। সে ইহুদি নিম্নপর্যায়ের পুরোহিতের সন্তান। কিন্তু দ্বিতীয় পরিবারটি– নিয়মানুসারে যে নিচু পরিবারে শিশুটি মানুষ হয়– সেটি এক্ষেত্রে ইজিপ্টের রাজপরিবার-এ বদলে গেছে; রাজকুমারী তাকে নিজের পুত্র হিসাবে মানুষ করে। প্রচলিত ধারা থেকে এই যে অপসরণ, এটা অনেক গবেষকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। এডুয়ার্ড মেয়ের এবং তার পরের কিছু গবেষক বিশ্বাস করতেন যে, কাহিনীটির মূল রূপ অন্যরকম ছিল। ফারাও-কে তাঁর স্বপ্নের মধ্যে একটি দৈববাণী সাবধান করে দিয়েছিল যে, তাঁর মেয়ের ছেলে, তাঁর এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিপদের কারণ হবে। সেইজন্যে তিনি শিশুটির জন্মের অব্যবহিত পরেই তাকে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শিশুটিকে ইহুদিরা বাঁচায় এবং নিজেদের সন্তানের মতো মানুষ করে। র‍্যাঙ্কের ভাষায়, "জাতীয়তাবাদী প্রেরণা" কাহিনীটিকে বর্তমান রূপ, যা আমরা জানি, দান করেছে।

যাই হোক, আরও বিচার বিবেচনার পর আমরা মনে করি যে, এই রকম একটি মূল মোজেস কাহিনী, যেটা অন্যান্য জন্মকাহিনীর থেকে আলাদা নয়, কখনোই তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কারণ কাহিনী বলছে, হয় ইজিপ্‌শিয়ান, না হয় ইহুদি উৎস থেকে মোজেসের উৎপত্তি। প্রথম ধারণাটা বাদ দেওয়া যেতেই পারে। ইজিপ্‌শিয়ানদের মোজেসকে মহিমান্বিত করার কোনো প্রয়োজন নেই; তাদের কাছে মোজেস নায়ক নয়। কাজেই কাহিনীর উৎপত্তি নিশ্চয়ই ইহুদিদের মধ্যেই হয়েছিল। অর্থাৎ কাহিনীটি প্রচলিত চেহারায় তাদের নেতার ব্যক্তিত্বে আরোপিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে, কাহিনীটি একদম খাপ খায় না; একটা জাতির কাছে সেই কাহিনীর মূল্য কি, যেখানে তাদের কাহিনীর নায়ক পরদেশী?

মোজেস কাহিনী, যেটা এখন আমরা জানি, তার গোপন অভিসন্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। মোজেসের যদি রাজপরিবারে জন্ম না হয়, তা'হলে আমাদের কাহিনী তাকে নায়ক বানাতে পারে না; আবার যদি সে ইহুদি থেকে যায়, তাহলে তার মর্যাদা বাড়ে না। পুরো কাহিনীটার একটা ছোট্ট অংশ কেবল কার্যকরী; কঠিন বাহ্যিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিশুটির বেঁচে থাকার আশ্বাস। যিশু খ্রিস্টের প্রথম জীবনেও এই জিনিসটা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে রাজা হেরোড, ফারাও-এর ভূমিকা নিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের এটা ভেবে নেওয়ার অধিকার আছে যে, কাহিনীটির বিষয়বস্তুতে পরবর্তী কোনো এলোমেলো হস্তক্ষেপে কাহিনীকার তার নায়ক মোজেসের ওপর ওই চিরায়ত জন্মবৃত্তান্তের পৌরাণিকতা আরোপ করেছিলেন, যেটা বিশেষ পরিস্থিতি বিচারে মোজেসের ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

এই অখুশী এবং অনিশ্চিত ফলাফল নিয়েই আমাদের তদন্তকে শেষ করতে হবে, মোজেস ইজিপ্‌শিয়ান কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল না, যদিও এই জন্মবৃত্তান্তের বিষয়টিকে অন্য আর একভাবে, হয়তো সফলতার সঙ্গেই আবার পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কাহিনী-উক্ত পরিবার দুটিতে ফিরে আসা যাক। আমরা জানি যে, বৈশ্লেষিক ব্যাখ্যার স্তরে দুটি পরিবারই একরকম। পৌরাণিক কাহিনীগত স্তরে, দুটি পরিবার মহান এবং নিম্ন, এই দুই মানের। একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যার সঙ্গে এই কাহিনী জড়িয়ে আছে, তার ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি স্তর আছে, সেটি হল বাস্তবতা। একটা পরিবার একদম বাস্তব, যে পরিবারে এই মহান ব্যক্তির সত্যসত্যই জন্ম হয়েছিল এবং যেখানে তিনি বড় হয়েছিলেন। অন্যটি মনগড়া, পৌরাণিক কাহিনী নিজের প্রয়োজনে ওটা তৈরি করেছে। নিয়মানুসারে, আসল পরিবারটি নিচুমানের হতে হবে, আর মহান পরিবারটি হবে কাল্পনিক। মোজেসের ক্ষেত্রে, কিছু একটা ভিন্ন ব্যাপার আছে। আর এখানেই নতুন দৃষ্টীভঙ্গী কিছু আলোকপাত করতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে, প্রথম পরিবারটি, যেখান থেকে নবজাত শিশুটিকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সমস্ত তুলনীয় গল্পগুলিতেই, কাল্পনিক; যদিও দ্বিতীয় পরিবারটি, যারা নায়ককে পালন করেছিল

এবং যেখানে ও বড় হয়েছিল, তার আসল পরিবার। যদি এই ব্যক্তিটিকে মোজেস কাহিনীর ব্যাপারে সাধারণ সত্য বলে ধরে নেওয়ার সাহস আমাদের থাকে, তাহলে আমরা হঠাৎ দেখতে পাব যে আমাদের পথ খোলা। মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান– বোধ হয় কোনো মহান পরিবারে জন্ম– যাকে কাহিনী ইহুদিতে পরিবর্তিত করার কাজ করে। এবং এটাই আমাদের উপসংহার। জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা ঠিকই আছে; শুধু এই নতুন উপসংহারের সঙ্গে মানানসই করার জন্য উদ্দেশ্যটা পাল্টাতে হবে, হিংস্রতা ছাড়া কিন্তু নয়। শিশুটিকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যের পরিবর্তে, এটা হয়ে দাঁড়াবে, শিশুটিকে বাঁচানোর পন্থা।

এই যে মোজেসের কাহিনী, এই রকম অন্য সব কাহিনীর চেয়ে কিছুটা আলাদা, সেটা মোজেসের জীবনের কাহিনীর একটা বিশেষ অংশে খুঁজে পাওয়া যায়। অন্য সব গল্পগুলির ক্ষেত্রে, নায়ক তার নীচুমানের জীবনযাত্রা থেকে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে, কিন্তু মোজেস নামক ব্যক্তিটির নায়কোচিত জীবন শুরু হয় তার মহানতা থেকে ইস্‌রায়েলের সন্তান পর্যায়ে নেমে এসে।

এই ছোট তদন্তটি শুরু করতে হয়েছিল এই আশায় যে, এর থেকে আমরা একটি দ্বিতীয় নতুন যুক্তি পাব, মোজেস যে একজন ইজিপ্‌শিয়ান তার স্বপক্ষে। আমরা দেখলাম যে, ওর নাম সম্পর্কে প্রথম যুক্তিতর্ক, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। নতুন যুক্তিগুলির জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে– জন্ম-পরবর্তী পরিত্যাগ করার যে পৌরাণিক কাহিনী, তার বিশ্লেষণে, বিশেষ সুবিধা হয়নি। আপত্তিটা এই হতে পারে যে, এই সব কাহিনীর উৎস ও পরিবর্তন ইত্যাদি এত অস্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী যে সিদ্ধান্ত, তা মানা যায় না, এবং মোজেসের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চারপাশের সমস্ত অসংলগ্নতা ও পরস্পরবিরোধিতার জন্য এবং বহু শতাব্দীর জমে থাকা উদ্দেশ্যপূর্ণ বিকৃতি ও স্তরবিন্যাসের দরুণ, ঐতিহাসিক সত্যের মর্মস্থলে পৌঁছানোর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি নিজে এই নাস্তিবাচক মনোভাব গ্রহণ করি না, কিন্তু আমি একে মিথ্যা বা ভুল বলে প্রমাণও করতে পারব না।

যদি এর চেয়ে বেশি নিশ্চয়তা না পাওয়া যায়, তাহলে সমগ্র জনসাধারণের সামনে এই তর্কটা আমি তুললাম কেন? আমি দু:খিত যে, আমার সততা প্রতিপাদন ও শুধু কয়েকটি ইঙ্গিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্য যদি কেউ ওপরে দেওয়া যুক্তিগুলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং মোজেস যে একজন বিশিষ্ট ইজিপ্‌শিয়ান ছিলেন, এই সিদ্ধান্তটি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে, তাহলে নানা চিত্তগ্রাহী ও সুদূরপ্রসারী দৃশ্যপট উন্মোচিত হবে। কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়ে, মোজেস যে অসাধারণ উদ্যোগটি নিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্যগুলিকে বোধগম্য করা যায়। আর এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মোজেস ইহুদিদের যে অনুশাসন ও ধর্ম দিয়েছিলেন, তার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পেছনে যে সম্ভাব্য উদ্দেশ্যগুলি, তা-ও অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে একেশ্বরবাদী ধর্মের উৎপত্তির সময়কার কিছু মুহূর্তের ধারণা শক্তিশালী

হয়ে ওঠে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বিবেচনাগুলি কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার ওপরই গড়ে উঠতে পারে না। এমনকি যদি কেউ মোজেস যে একজন ইজিপ্‌শিয়ান এটাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরেও নেয়, তাহলেও আমাদের অন্ততঃ আরও একটা স্থির বিন্দু চাই, যাতে অগণিত যে সম্ভাবনাগুলো উঠে আসবে, সেগুলিকে কাল্পনিক এবং অবাস্তব, এই নিন্দাবাদ থেকে বাঁচাতে পারা যায়। যে সময়কালে মোজেসের জীবন ও ইজিপ্ট থেকে বহির্নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি ঘটনাবলী বিধৃত ছিল, তার একটা বাস্তব প্রমাণ হয়ত যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু সেটাও তো হচ্ছে না, কাজেই আমাদের যে অভিমত, যে মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান, তার পরবর্তী অনুমিতিগুলিকে চেপে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

২য় পর্ব: যদি মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান হন

এই বইয়ের ১ম পর্বে আমি নতুন একটা যুক্তি দিয়ে আমার এই ধারণাটাকে শক্তিশালী করতে চেয়েছি যে, মোজেস নামক ব্যক্তিটি, যিনি ইহুদিদের মুক্তিদাতা এবং অনুশাসন প্রবর্তক, তিনি আসলে ইহুদি ছিলেন না, একজন ইজিপ্‌শিয়ান ছিলেন। তার নামটি যে ইজিপ্‌শিয়ান শব্দভান্ডার থেকে আহরিত, সেটা দীর্ঘদিন জানা থাকলেও তার মর্মোপলব্ধি হয়নি। এই বিবেচনার সঙ্গে আমি আরও একটা ব্যাপার যোগ করেছিলাম যে, মোজেস্-এর ওপর আরোপিত পরিত্যক্ত শিশুর পৌরাণিক কাহিনীটার ব্যাখ্যার জন্যই মোজেস যে ইজিপ্‌শিয়ান, যাকে একটি জাতি ইহুদিতে পরিণত করেছিল, এই সিদ্ধান্তটিতে আসার প্রয়োজন ছিল। প্রবন্ধের শেষে আমি বলেছিলাম যে, মোজেস যে একজন ইজিপ্‌শিয়ান এই অভিমতটি থেকে জরুরী এবং সুদুরপ্রসারী উপসংহার টানা যেতে পারে। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে আমি এটা সমর্থন করতে চাইনি, কারণ এগুলো শুধু মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার ওপর দাঁড়িয়েছিল এবং বাস্তব প্রমাণ ছিল না। উপলব্ধ সম্ভাবনাগুলো যত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কোনো শক্ত ভিতের উপর সেগুলো দাঁড়িয়ে না থাকায়, তাদের বহির্বিশ্বের দোষদর্শী আক্রমণের সামনে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে– ব্যাপারটা ঠিক মাটির তৈরি পা-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোহার স্তম্ভের মতো। কোনো সম্ভাব্যতাই, যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, আমাদের ভুল করা থেকে বাঁচাতে পারে না; এমনকি, কোনো সমস্যার সমস্ত টুক্‌রোই যদি টুক্‌রো করা ছবির ধাঁধাঁ-র মতোই ঠিক মতো জোড়া যায়, তবুও মনে রাখতে হবে যে, সম্ভাব্যতা যে সত্য হবে, তার কোনো মানে নেই, আবার সত্যকেও সবসময় সম্ভাব্যতা হিসাবে পাওয়া যায় না। এবং সর্বশেষে, পান্ডিত্যমনা ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থের গ্রন্থীদের সঙ্গে একাসনে বসাটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়, কারণ তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রয়োগ করেই সন্তুষ্ট, তাদের উপসংহার সত্য থেকে কত দূরে অবস্থিত, তাতে তাঁদের কিছুই যায় আসে না।

এতসব সন্দেহ থাকলেও, যা আগেও ছিল, আজও আছে, আমার উদ্দেশ্যগুলির সংঘাত থেকে একটি সিদ্ধান্তই উঠে আসে যে, আমার প্রথম প্রবন্ধটির পরে আরো কিছু উপস্থাপনা দরকার। কিন্তু আবারও বলি, এটাও কিন্তু সমগ্রের অংশবিশেষ হবে এবং এমন নয় যে, এই অংশবিশেষটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

১.

তা'হলে মোজেস যদি একজন ইজিপ্‌শিয়ানই হন, এই অভিমতটি থেকে প্রথম লাভ হল, একটি নতুন ধাঁধা, যার উত্তর মেলা খুব কঠিন। যখন কোনো জাতির লোকেরা একটা মহান কর্মকাণ্ডের জন্য তৈরি হয়, তখন আশা করা যায় যে, তাদের মধ্যে কোনো একজন নিজেকে নেতা হিসাবে ঘোষণা করবে, অথবা নেতা হিসাবে নির্বাচিত হবে। কিন্তু কী কারণে, একজন বিশিষ্ট ইজিপ্‌শিয়ান– হয়ত একজন রাজকুমার, পুরোহিত, বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক তাঁর চেয়ে অনেক নিম্ন সংস্কৃতির অভিবাসী দলের শীর্ষে নিজেকে অধিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, সেটা সহজবোধ্য নয়। বিদেশীদের প্রতি ইজিপ্‌শিয়ানদের ঘৃণা সকলেই জানে এবং তাই এই রকম ঘটনা না ঘটারই কথা। সত্যিই, আমিও ভাবছি যে, এই জন্যই বোধহয় সেই সমস্ত ঐতিহাসিক যারা মোজেসের নামটা ইজিপ্‌শিয়ান বলে বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইজিপ্টের সমস্ত জ্ঞানভান্ডার তার ওপর অর্পণ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান, এই সুস্পষ্ট সম্ভাবনাটি মানতে রাজী হননি।

এই প্রথম বাধাটির পেছনে দ্বিতীয় আর একটি বাধা আছে। একথা ভুললে চলবে না যে, মোজেস, ইজিপ্টে বসবাসকারী ইহুদিদের কেবল রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি তাদের অনুশাসন দিয়েছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের একটি নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন, যে ধর্মকে আজও তাঁর নামে মোজেইক নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একটি একক লোক কি একটি নতুন ধর্ম এত সহজে সৃষ্টি করতে পারে? এবং যখন কেউ অন্যের ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তখন সেই লোকটিকে নিজের প্রবর্তিত ধর্মে ধর্মান্তর করাটাই কি স্বাভাবিক নয়? ইজিপ্টের ইহুদিদের নিশ্চয়ই কোনো ধর্ম ছিল, আর মোজেস, যিনি ওদের একটি নতুন ধর্ম দিয়েছিলেন, যদি একজন ইজিপ্‌শিয়ান হন, তাহলে এই ধারণাটা ফেলে দেওয়া যাবে না যে, তিনি যে ধর্মটি প্রবর্তন করেছিলেন, সেটি ছিল ইজিপ্‌শিয়ান ধর্ম।

এই সম্ভাবনাটিরও আবার একটি বাধা আছে। মোজেসকে যার প্রবর্তক বলা হয়, সেই ইহুদি ধর্ম এবং ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মের মধ্যে একটা দারুণ বৈষম্য। প্রথমটি একটি আড়ম্বরপূর্ণ কঠোর একেশ্বরবাদ। ঈশ্বর একজনই আছেন, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, অনভিগম্য। তাঁর কোনো মুখাবয়ব নেই, তাঁর মূর্তি তৈরি

করা মানা, তাঁর নাম নেওয়াও মানা। অন্যদিকে ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মে অসংখ্য দেবদেবী, তাঁদের আলাদা আলাদা গুরুত্ব, আলাদা আলাদা উৎপত্তি। এদের মধ্যে কেউ কেউ মহান প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মূর্ত রূপ। যেমন স্বর্গ, মর্ত্য, সূর্য এবং চন্দ্র। এছাড়া পাই, কিছু বিমূর্ত রূপ, যেমন মাত (ন্যায়, সত্য) অথবা, বীভৎস প্রাণী যেমন, বামনাকৃতি 'বেস'। এদের বেশির ভাগই অবশ্য, দেশটা যখন অনেক প্রদেশে ভাগ হয়েছিল, তখন থেকেই স্থানীয় দেবতা। এদের আকৃতি সব পশুদের মতো, যেন এরা, সম্প্রদায়গুলির যে প্রতীকি প্রাণী ছিল, তার থেকে বেরোতে পারেনি। এদের ঠিক পরিষ্কারভাবে আলাদা করা যায় না, এদের কারো কারো ওপর যে বিশেষ কর্মভার অর্পণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও। এই সব দেব-দেবীর যে স্তুতিগান করা হয়, সেগুলো সকলের সম্বন্ধেই একই কথা বলে, একজনের সঙ্গে আরেকজনকে চিহ্নিত করে, আর সেটা এমন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে পড়ে। দেবদেবীর নামগুলো একজনেরটা আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে একজনের যখন গুণকীর্তন হয়, তখন অপরজনকে হেয় করা হয়। "নতুন সাম্রাজ্যে"র সবচেয়ে ভালো সময়ে, থেবেস নগরীর প্রধান দেবতার নাম ছিল 'আমন-রে', যার প্রথম অংশটার মানে হচ্ছে ভেড়ার মাথা ওয়ালা শহরের দেবতা, আর 'রে' হচ্ছে বাজ-পাখির মাথাওয়ালা ওন্‌-এর সূর্যদেবতার নাম। এই সব দেবতাদের পুজোতে থাকত জাদুবিদ্যা, আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, মন্ত্রপূত: কবচ, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি এবং এগুলো ইজিপ্‌শিয়ানদের প্রাত্যহিক জীবনেরও অঙ্গ ছিল।

একটা গোঁড়া একেশ্বরবাদ এবং একটা সীমাহীন বহু-ঈশ্বরবাদের মৌলিক তত্ত্বগুলির মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তার থেকে সহজেই কিছু কিছু প্রভেদ এসে যায়। অন্য প্রভেদগুলো স্পষ্টত:ই বুদ্ধিমত্তার স্তরের প্রভেদ। একটি ধর্ম প্রায় আদিম, অন্যটি একেবারে স্বর্গীয় বিমূর্ত। বোধ হয় এই দুটো বৈশিষ্ট্যই ইঙ্গিত করে যে, মোজেইক ধর্ম ও ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মের যে বৈসাদৃশ্য, তা ইচ্ছাকৃত এবং জোর করে চাপানো; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন একটি ধর্মে কোনোরকম জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি ইত্যাদি ভীষণভাবে নিন্দনীয়, তখন অন্য ধর্মে এগুলি প্রবলভাবে বিকশিত; অথবা ইজিপ্‌শিয়ানদের মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে, ধাতু দিয়ে তাদের দেবদেবীর মূর্তি গড়ার যে তৃপ্তিহীন উৎসাহ, যার কাছে আমাদের সংগ্রহশালাগুলো ঋণী, সেটার বিপরীত হচ্ছে, অন্য ধর্মে কোনো জীবিত বা দূরদর্শী মহাপুরুষদের মূর্তি তৈরি করা স্পষ্টত: নিষিদ্ধ।

এই দুটো ধর্মের মধ্যে আরও একটা প্রভেদ রয়েছে, যেটা আমার এ পর্যন্ত দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি স্পর্শ করেনি। প্রাচীন কালের অন্য কোনো জাতিই মৃত্যুকে অস্বীকার করার জন্য এত কিছু করেনি; মরণোত্তর জীবনের জন্য কত সযত্ন ব্যবস্থা করে রেখেছে; আর এই কারণেই, মৃত্যুর দেবতা ওসিরিস, সেই জগতের অধীশ্বর, সমস্ত ইজিপ্‌শিয়ান দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অবিসম্বাদী। অন্যদিকে, প্রারম্ভিক ইহুদি ধর্ম

অমরত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে; এই ধর্মের কোনো জায়গাতেই মরণোত্তর কোনো অস্তিত্বের সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়নি। আর এটা আরো বেশি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, পরবর্তী অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে মরণোত্তর জীবনের ওপর বিশ্বাস, একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে ভালোই খাপ খেয়ে যেতে পারে।

আশা করেছিলাম যে, মোজেস যে একজন ইজিপ্‌শিয়ান, আমাদের এই অভিমতটি নানাভাবে আলোকপাত করবে এবং উদ্দীপনা জোগাবে। কিন্তু আমাদের এই অভিমত থেকে প্রাপ্ত প্রথম অনুমান– যে নতুন ধর্মটি উনি ইহুদিদের দিয়েছিলেন, সেটি তার নিজস্ব, ইজিপ্‌শিয়ান ধর্ম– এই দুই ধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ– না, জ্বলন্ত বৈষম্য– তার ওপর হোঁচট খায়।

২.

ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মের ইতিহাসের একটা অদ্ভুত বিষয়, যেটা বেশ দেরিতে বোঝা গেছে এবং পরীক্ষিত হয়েছে, সেটা আরেকটা দৃষ্টিকোণ খুলে দেয়। এটা এখন বলা সম্ভব যে, মোজেস তার ইহুদি জাতিকে যে ধর্মটি দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর নিজস্ব একটি ইজিপ্‌শিয়ান ধর্ম, এবং আসল ইজিপ্‌শিয়ান ধর্ম নয়।

রাজবংশের মহান অষ্টাদশ পুরুষে, যখন ইজিপ্ট সর্বপ্রথম একটি বিশ্বশক্তিমান দেশ হিসাবে পরিচিত হল, একজন অল্পবয়েসি ফারাও সিংহাসনে আরোহণ করলেন, আনুমানিক ১৩৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যিনি নিজের নাম ঘোষণা করলেন, 'আমেন হোটেপ' (৪), তার পিতার মতো, কিন্তু পরবর্তীকালে আবার নামটি পরিবর্তন করলেন এবং শুধু নামই নয়, তিনি তার প্রজাদের ওপর একটা নতুন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দিলেন, তাদের পুরোনো রীতিনীতির এবং তাদের সমস্ত পারিবারিক অভ্যাসের পরিপন্থী একটি ধর্ম। এটি অত্যন্ত গোঁড়া একেশ্বরবাদ, পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা, অন্ততঃ আমরা যতটুকু জানি; এবং এই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার, এর আগে প্রাচীনকালে এবং পরেও দীর্ঘদিন ধরে যা অজানা ছিল।

কিন্তু আমেন হোটেপ-এর রাজত্বকাল চলেছিল মাত্র সতেরো বছর; এবং ১৩৫৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তার মৃত্যুর পর পরই, তার প্রবর্তিত নতুন ধর্ম ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হল এবং সেই প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী রাজার নাম পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। তিনি যে নতুন রাজধানী তৈরি করেছিলেন এবং তার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ থেকে এবং সেখানকার পাথরের সমাধিস্তম্ভগুলোর ওপর উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে, আমরা তার সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পেয়েছি। এই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, প্রকৃতপক্ষে অনন্য ব্যক্তিটির সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারব, সেগুলি সত্যিই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

যা কিছু নতুন, তার শেকড় কিন্তু পুরোনোতেই থাকবে। ইজিপ্‌শিয়ান একেশ্বরবাদের উৎস কিন্তু নিশ্চিতভাবেই অনেকটা পেছন দিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ওন্-এর সূর্যমন্দিরে (হেলিও পোলিস্) পুরোহিত মণ্ডলীর মধ্যে কিছুদিন ধরেই একজন সর্বজনীন ঈশ্বর ও তাঁর নৈতিকতার ওপর জোর দিয়ে একটা ধারণা সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। মাত, যিনি সত্য, শৃংখলা ও ন্যায় এর দেবী, সূর্য-দেবতা 'রে'-র কন্যা ছিলেন। পূর্ব বর্ণিত সংস্কারক ফারাও এর পূর্বসূরি ও পিতা আমেন হোটেপ ৩-এর রাজত্বকালে ইতিমধ্যেই সূর্য-দেবতার পুজো বেড়ে গিয়েছে, থেবেসের আমন দেবতার পুজোর বিরোধীতায়, কারণ তিনি বড় বেশি বিশিষ্টতা লাভ করছিলেন। সূর্যদেবতার একটা বহু প্রাচীন নাম আটন, বা আটুম, পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই আটন-ধর্মে, যুবক রাজা একটা আন্দোলনের সন্ধান পেয়েছিলেন, যেটা তার নিজের তৈরি করার কোনো প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু যেটাতে উনি যোগদান করতে পেরেছিলেন।

ওই রকম সময়ে ইজিপ্টের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মের ওপর একটা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। মহান বিজেতা তুতমিস ৩-এর শাণিত জয়ী তরবারী ইজিপ্ট-কে একটা বিশ্ব শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। দক্ষিণে নুবিয়া, উত্তরে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার-র একটা অংশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যবাদ, সর্বজনীন ও একেশ্বরবাদ রূপে ধর্মেও প্রতিফলিত হয়েছিল। যেহেতু ফারাও এর অধিকার এখন ইজিপ্টের বাইরে নুবিয়া ও সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত, দেবতাকেও তাই জাতীয় সীমা বিসর্জন দিতে হয়েছিল এবং ইজিপ্‌শিয়ানদের নতুন ঈশ্বরকে, ফারাও-এর মতোই হতে হয়েছিল– পৃথিবীতে একটি অদ্বিতীয় এবং সীমাহীন সার্বভৌমত্ব। তাছাড়া, এটাও স্বাভাবিক যে, সাম্রাজ্যের সীমা যতই বাড়ছিল, ততই বিদেশী প্রভাবও ইজিপ্টে ঢুকতে পারছিল; রাজার কয়েকজন স্ত্রী এশিয়া মহাদেশের রাজকুমারী ছিলেন এবং খুব সম্ভব, সিরিয়া থেকেও একেশ্বরবাদের অনুকূলে প্রত্যক্ষ সমর্থন ঢুকে পড়েছিল।

ওন্-এর সূর্য পূজায় নিজের উত্তরণকে আমেন হোটেপ কখনোই অস্বীকার করেননি। পাথরের সমাধি-গৃহে খোদিত আটন-এর নামে যে দুটি স্তোত্র-গাথা আমরা পেয়েছি, এবং যেগুলি খুব সম্ভব, তার নিজের রচনা, তাতে তিনি সূর্যকে, ইজিপ্ট ও ইজিপ্টের বাইরের সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে ভজনা করেছেন এবং সেটা এমন আকুলতার সঙ্গে করেছেন, যা অনেক শতাব্দী পরে ইহুদি দেবতা, যাহ্‌ভে-র স্তুতিতে রচিত প্রার্থনা বই-এ দেখা যায়। কিন্তু সূর্যের আলোর প্রভাব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার যে বিস্ময়কর অনুমান উনি করেছিলেন, সেখানেই উনি থেমে থাকেননি। সন্দেহ নেই, উনি আরও এগিয়েছিলেন; যেমন, উনি সূর্যকে একটি জড়বস্তু হিসাবে পুজো করতেন না, একজন স্বর্গীয় অস্তিত্বের প্রতীক হিসাবে পুজো করতেন, যাঁর শক্তি বিকশিত হয় তাঁর রশ্মি থেকে।

কিন্তু রাজাকে আমরা যদি কেবলমাত্র আটন ধর্মের অনুগামী ও রক্ষক হিসাবে দেখি, যে ধর্ম তাঁর আগেও বিদ্যমান ছিল, তাহলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। তাঁর কার্যকলাপ ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। তিনি নতুন এমন একটা কিছু এই ধর্মে যোগ করেছিলেন, যা সর্বজনীন ঈশ্বরীয় মতবাদকে একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত করেছিল : সেটা হচ্ছে, স্বাতন্ত্র্যগুণ। তাঁর একটি স্তব গান-এ বলা হচ্ছে "হে একমাত্র ঈশ্বর, তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ঈশ্বর নেই।" আর আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই নতুন মতবাদের মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে, কেবল তার ইতিবাচক সারমর্ম জানাটাই যথেষ্ট নয়; প্রায় সমগুরুত্ব দিতে হবে তার নেতিবাচক দিকটাতেও-এই মতবাদ কী প্রত্যাখ্যান করছে, সেই জ্ঞানটাও থাকা চাই। আর আমরা যদি ভাবি যে, এই নতুন ধর্ম, জিউস-এর কপাল থেকে এথেনার বেরোনোর মতো, একদম সব দিক থেকে সম্পূর্ণতা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে, সেটাও ভুল হবে। বরং সবদিক বিচার করলে এটাই দেখা যায় যে, আমেন হোটেপ-এর রাজত্বকালে এই ধর্মটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে, যাতে এই ধর্ম আরো বেশি স্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা, কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়। বোধ হয়, আমন-এর পুরোহিত সম্প্রদায়, যারা রাজার এই সংস্কার কর্মের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তাদের কঠোর বিরোধিতার প্রভাবেই, এই বিকাশ ঘটে। আমেন হোটেপের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে এই শত্রুতা এত বেড়ে যায় যে, রাজা নিজের নাম পরিবর্তন করেন, কারণ তাঁর নামের একটা অংশে বর্তমানে নিষিদ্ধ আমন দেবতার নাম ছিল। আমেন হোটেপ-এর পরিবর্তে উনি নিজের নাম রাখলেন, ইখনাতন। কিন্তু শুধু নিজের নাম থেকেই এই ঘৃণ্য দেবতার নাম উড়িয়ে দিয়েই উনি ক্ষান্ত হলেন না, সমস্ত প্রস্তরলিপি থেকে, এমনকি ওঁর পিতার নাম, আমেন হোটেপ ৩ থেকেও নামটি ছেঁটে ফেললেন। নাম পরিবর্তনের পরেই ইখ্নাতন, থেবেস, যেটা আমনের শাসনে ছিল, ছেড়ে চলে যান এবং নদীর আরো নীচের দিকে একটা নতুন রাজধানী তৈরি করেন, যার নাম দেন আখেটাটন (আটন এর দিগন্ত)। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে টেল-এল-অমর্না নামে পরিচিত।

রাজা কর্তৃক এই লাঞ্ছনা মুখ্যতঃ আমন এর বিরুদ্ধেই ছিল, তবে আমন একা নন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র মন্দিরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, পূজার্চনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং সমস্ত দেবত্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এমনকি, রাজার উৎসাহ এতদূর এগিয়েছিল যে, পুরোনো স্মৃতিস্তম্ভগুলোর উপর খোদিত শিলালিপি সম্বন্ধে খোঁজ খবরও শুরু করা হয়েছিল, যাতে 'ঈশ্বর' শব্দটা যেখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই জায়গাগুলো মুছে ফেলা যায়। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই আদেশগুলো দমিয়ে রাখা পুরোহিত সম্প্রদায় ও অসন্তুষ্ট প্রজাকুলের মধ্যে একধরনের প্রতিহিংসামূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যে প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল রাজার মৃত্যুর পর। আটন ধর্মটি লোকেদের পছন্দ হয়নি; বোধহয় ইখ্নাতনের চারপাশের লোকেদের একটা ছোট্ট বৃত্তের

মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর মৃত্যুটাও রহস্যে ঘেরা। তাঁর নিজের পরিবারের কয়েকজন স্বল্পজীবি, ছায়াবৃত উত্তরাধিকারীর কথা জানা যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর জামাতা টুটেন খাটন, থেবেস-এ ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং আটন দেবতার জন্য নিজের নামে আমন কথাটা ব্যবহার করতেও বাধ্য হন। তারপরেই একটা সময় ধরে অরাজকতা চলতে থাকে, যতদিন না সেনাধ্যক্ষ হারেমহাব ১৩৫০ খ্রিঃ পূঃ সিংহাসন দখল করে সাম্রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন। মহান অষ্টাদশ রাজবংশ নিভে যায়; আর সেই সঙ্গে নুবিয়া ও এশিয়ার ওপর এদের দখলদারীও শেষ হয়ে যায়। আর এই দু:খজনক মধ্যবর্তীকালে ইজিপ্টের পুরোনো ধর্ম পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। আটন-ধর্ম শেষ হয়ে গেল, ইখ্নাতন-এর রাজধানী ধ্বংস হয়ে গেল, লুটপাট হয়ে গেল এবং মানুষের স্মৃতিতেও তিনি একজন দুর্বৃত্ত হিসাবে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে রইলেন।

এখন যদি আমরা আটন ধর্মের কিছু নেতিবাচক দিক লক্ষ করি, তাহলে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমত: সমস্ত পৌরাণিকতা, ভোজবিদ্যা, জাদু এইসব এর থেকে বাদ দিতে হবে।

তারপর দেখতে হবে, সূর্য দেবতাকে কী রকম ভাবে দেখানো হয়েছিল; আগেকার দিনে যেমন দেখাত, তেমনি ছোট পিরামিড বা বাজপাখি দিয়ে নয়, কিন্তু- এটা প্রায় যুক্তিসম্মত– একটা গোল চক্র দিয়ে, যার থেকে রশ্মি বার হয়ে মানুষের হাতে পড়ছে। অমর্নাযুগে যথেষ্ট শিল্প-প্রীতি সত্ত্বেও সূর্য দেবতা আটন-এর একটাও ব্যক্তিগত চিত্র পাওয়া যায়নি, এবং আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, কোনোদিন পাওয়াও যাবে না।

সবশেষে, মৃত্যুর দেবতা অসিরিস এবং মৃতদের এলাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা। ইজিপ্শিয়ানদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের যে প্রসঙ্গ, সে ব্যাপারে কোনো স্তোত্র গাথা বা সমাধির ওপর উৎকীর্ণ কোনো লিপিতেই কোনো উল্লেখ নেই। জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে এই বৈসাদৃশ্য এর চেয়ে স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে না।

৩.

এইবার আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসতে চাইছি : যদি মোজেস একজন ইজিপ্শিয়ান হন এবং যদি তিনি তাঁর ধর্ম ইহুদিদের দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা হবে ইখ্নাতন-এর পালিত আটন-ধর্ম।

এর আগে আমি ইহুদিদের ধর্মকে ইজিপ্শিয়ান জাতির ধর্মের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম এবং দেখিয়েছিলাম এরা পরস্পরের থেকে কত আলাদা। এবার আমরা ইহুদি ধর্মের সঙ্গে আটন-ধর্মের তুলনা করব এবং তারা যে আদিতে একই রকম ছিল, আশা করি, সেটা দেখাতে পারব। জানি এটা সহজ কাজ নয়। আটন-ধর্ম

সম্বন্ধে আমরা বোধহয় বেশি কিছু জানিনা, তার কারণ আর কিছু নয়, আমন-পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিশোধ-স্পৃহা। মোজেইক ধর্ম সম্বন্ধেও আমরা তার শেষ পর্যায়ের রূপটাই জানি, যেটা ইহুদি পুরোহিতরা নির্বাসন-এর পরের সময়ে, প্রায় আটশো বছর পরে, ঠিক করেছিল।

মোজেইক ধর্ম যে আটন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের এই মতবাদ প্রমাণ করবার একটা সহজ রাস্তা আছে। অর্থাৎ, একটি বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দ্বারা অথবা একটি ঘোষণা দ্বারা। কিন্তু ভয় হচ্ছে, আমাকে বলা হবে যে, এই রাস্তাটি বাস্তবে অকার্যকর। ইহুদি ধর্মবিশ্বাসে, সকলেই জানে, বলা হয়েছে : "স্কিমা জিস্‌রোয়েল আদোনাই এলোহেনু আদোনাই এচদ্।" যদি ইজিপ্‌শিয়ান আটন (অথবা, আটুম) নামটির সঙ্গে হিব্রু শব্দ আদোনাই এবং সিরিয়ান পবিত্র নাম আদোনিস-এর সাদৃশ্য একটি দুর্ঘটনামাত্র না হয়ে থাকে, কিন্তু আদিম যুগের ভাষার এবং অর্থের একাত্মতার ফলস্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে ইহুদি সূত্রটিকে অনুবাদ করাই যায় : "শোনো হে ইস্‌রায়েল, আমাদের ঈশ্বর আটন (আদোনাই) হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর।" এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো গুণগত যোগ্যতা আমার নেই এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্যেও এ বিষয়ে খুব কমই দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় পুরো ব্যাপারটাকে এত সরলভাবে দেখানো ঠিক হবে না। তাছাড়া, এই পবিত্র নামের সমস্যাটিতে আমাদের ফিরে আসতে হবে।

দুটো ধর্মের সাদৃশ্যের ও বৈসাদৃশ্যের জায়গাগুলো সহজেই নির্ণয় করা যায়, কিন্তু তাতে আমাদের সমস্যায় কোনো আলোকপাত হয়না। দুটি ধর্মই গোঁড়া একেশ্বরবাদের রূপ এবং উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের মূল চরিত্রে আমরা যেতে চাইব। ইহুদি একেশ্বরবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইজিপ্‌শিয়ান-এর চাইতেও অনেক বেশি আপসহীন– যেমন, যেখানে এই ধর্ম ঈশ্বরের সমস্ত রকমের দৃষ্টরূপ নিষিদ্ধ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য এই যে, ইহুদি ধর্ম সূর্যের পূজা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে, যেটা ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মে এখনও আছে, তাছাড়া এই ধর্মে ঈশ্বরের নামও আলাদা। ইজিপ্‌শিয়ান লোকধর্মের সঙ্গে ইহুদি ধর্মের তুলনা করলে আমাদের এই মনে হয় যে, আদর্শগত বৈষম্য ছাড়াও, দুই ধর্মের এই বিভেদের মধ্যে একটা ইচ্ছাকৃত বৈপরীত্য আনা হয়েছে : আমরা যখন এই তুলনামূলক বিচারের সময় ইহুদি ধর্মের জায়গায় আটন-ধর্মকে নিয়ে আসি, যেটা ইখ্‌নাতন জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত শত্রুতা করে বিকশিত করেছিলেন, তখন আমাদের ধারণাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আমরা অবাক হয়েছিলাম, সঠিকভাবেই, যে ইহুদি ধর্মে কবরের পরে কোনো জীবনের কথা বলে না, কারণ এই ধরণের মতবাদ একেবারে গোঁড়া একেশ্বরবাদের সঙ্গেই মেলে। অবশ্য, আমাদের এই অবাক হওয়াটা আর থাকে না, যখন আমরা ইহুদি ধর্ম থেকে আটন-ধর্মে চলে যাই আর ভাবি যে, এই ব্যাপারটা আটন ধর্ম থেকেই নেওয়া হয়েছে, যেহেতু

ইখ্‌নাতনের পক্ষে জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে লড়াই করাটা জরুরী ছিল এই কারণে যে, ওই ধর্মে মৃত্যুর দেবতা অসিরিস্‌-এর প্রভাব তখনকার উত্তরাঞ্চলের অন্য দেবতাদের চাইতে অনেক বেশি ছিল। আটন ধর্মের সঙ্গে ইহুদি ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিলটা আমাদের মতবাদের স্বপক্ষে প্রথম জোরালো যুক্তি। এবারে আমরা দেখব যে, এটাই একমাত্র নয়।

মোজেস ইহুদিদের শুধু একটা নতুন ধর্মই দেননি, তিনিই যে সুন্নৎ-এর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এই বিষয়টা আমাদের সমস্যার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এটাকে কখনোই ঠিকমতো বিচার করা হয়নি। অবশ্য এটাও সত্যি যে, বাইবেলের কাহিনীতে এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই কাহিনী একদিকে বলছে যে, এই প্রথা গোষ্ঠীপতিদের আমলে শুরু হয়েছিল, ঈশ্বর আর আব্রাহামের মধ্যে চুক্তির অঙ্গ হিসেবে। আবার অন্যদিকে, এই কাহিনী একটা, বিশেষ করে দুর্বোধ্য অংশে বলছে যে, মোজেস এই প্রথাটার ব্যবহার উপেক্ষা করেছিলেন বলে ঈশ্বর মোজেসের ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন এবং শাস্তি হিসেবে মোজেসকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। মোজেসের স্ত্রী, মিডিয়ান দেশের মেয়ে, দ্রুত ত্বকচ্ছেদ করে তার স্বামী মোজেস্‌কে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে বাঁচান। এগুলো অবশ্য তথ্যবিকৃতি, আর আমাদের বিপথে পাঠাতে পারে। আমরা এখন এগুলোর উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করব। এটা সত্য যে, সুন্নৎ-এর সূত্রপাতের প্রশ্নের একটাই জবাব, এটা এসেছে ইজিপ্ট থেকে। "ইতিহাসের জনক" হেরোডোটাস বলেছেন যে, সুন্নৎ-করার প্রথাটা ইজিপ্টে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত এবং তাঁর এই বক্তব্য মমিগুলোর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত এবং কবরের দেওয়ালের ওপর আঁকা চিত্রগুলি থেকেও প্রমাণিত। আমরা যতদূর জানি, পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্য কোনো জাতিই এই প্রথা অনুসরণ করত না। আমরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি যে, সেমাইটরা, ব্যাবিলোনিয়ানরা এবং সুমেরীয়রা সুন্নৎ-করা ছিল না। বাইবেলের ইতিহাসও ক্যানানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে একই কথা বলে। জ্যাকবের কন্যা ও শেচেম-এর রাজকুমারের মধ্যে দুঃসাহসিক সম্পর্কের যে কাহিনী, সেখানেও এই ব্যাপারটা ধরে নেওয়া হয়েছে। ইজিপ্টে ইহুদিরা, মোজেস যে ধর্ম তাদের দিয়েছিলেন, তার বাইরে অন্য কোন প্রভাবে সুন্নৎ-এর এই প্রথা গ্রহণ করেছিল, এ ধরনের সম্ভাবনার কথা ধোপে টিকবে না বলে বাদ দেওয়া যায়। এবারে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইজিপ্টের অধিবাসীরা সুন্নৎ করত একটা সাধারণ প্রথা হিসাবে এবং আমরা এই মুহূর্তে একটা স্বাভাবিক অনুমান করতে পারি যে, মোজেস একজন ইহুদি ছিলেন, যিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের একজন ইজিপ্‌শিয়ান শাসনকর্তার হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং তাদের দেশ থেকে বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা একটা স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী অস্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে, যেটা উনি পেরেছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে

উনি যে, একই সময়ে ওদের ওপর একটা বোঝার মতো প্রথা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন; যেটা সঠিকভাবে বলতে গেলে, ওদের ইজিপ্‌শিয়ান বানিয়ে দিত আর ওদের স্মৃতিতে ইজিপ্টের কথা জাগরুক থাকত, তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে, যখন ওঁর উদ্দেশ্যই ছিল ঠিক এর বিপরীত; অর্থাৎ তাঁর অনুসরণকারী লোকেরা তাদের দাসত্বের শৃংখলে বেঁধে রাখা দেশটায় বিদেশী হবে এবং ইজিপ্টের ভোগসুখের প্রতি আকাংখাকে জয় করবে। না, যে সত্য ঘটনা থেকে আমরা শুরু করেছি আর এর সঙ্গে যে নিজস্ব ধারণা যোগ করেছি, সেগুলো একটি অপরের সঙ্গে এমন সাযুজ্যবিহীন যে আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি; যদি মোজেস ইহুদিদের কেবলমাত্র একটি ধর্মই না দিয়ে, তার সঙ্গে সুন্নৎ-এর আইন-ও দিয়ে থাকেন, তাহলে উনি ইহুদি ছিলেন না, একজন ইজিপ্‌শিয়ান ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে মোজেইক ধর্মটা সম্ভবতঃ একটা ইজিপ্‌শিয়ান ধর্মই হবে, অর্থাৎ– জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে বৈষম্যের দরুণ, হয়তো আটন-ধর্ম, যার সঙ্গে ইহুদি ধর্ম কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে একাত্মতা পোষণ করে।

আগে যেমন বলেছিলাম, আমার প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত যে, মোজেস একজন ইহুদি ছিলেন না, উনি ছিলেন একজন ইজিপ্‌শিয়ান, এতে একটা নতুন হেঁয়ালি সৃষ্টি করে। উনি যা করেছিলেন-যদি উনি ইহুদি হতেন, তাহলে সহজেই বোঝা যেত– তা কিন্তু একজন ইজিপ্‌শিয়ানের পক্ষে বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু মোজেসকে যদি আমরা ইখ্‌নাতনের সময়ে নিয়ে আসি আর ওঁকে সেই ফারাও-এর সঙ্গে যুক্ত করি, তাহলে এই হেঁয়ালির সমাধান হবে এবং একটা সম্ভাব্য উদ্দেশ্যও উঠে আসবে, যার দ্বারা আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ধরা যাক, মোজেস একজন উল্লেখযোগ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন; হয়তো রাজপরিবারের সদস্য, পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন বর্ণনা করা আছে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অসাধারণ সামর্থ্য, উচ্চাকাংখা এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; হয়তো তিনি নিজেকে সুদূর ভবিষ্যতে তাঁর জাতির নেতা হিসাবে দেখেছিলেন, সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হিসাবে। ফারাও-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে তিনি ফারাও প্রবর্তিত নতুন ধর্মের বিশ্বস্ত অনুরাগী ছিলেন, যে ধর্মের মূল আদর্শগুলি তিনি সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন এবং নিজের করে নিয়েছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলি দেখে তাঁর সমস্ত আশা-প্রত্যাশা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এত প্রিয় ধর্মবিশ্বাসগুলো যদি পরিহার না করতে চান, তাহলে ইজিপ্টের আর তাঁকে দেওয়ার কিছু নেই; তিনি তাঁর নিজের দেশটি হারালেন। এই সন্ধিক্ষণে উনি একটা অভূতপূর্ব সমাধান পেয়ে গেলেন। স্বপ্নবিলাসী ইখ্‌নাতন তাঁর নিজের জাতির লোকেদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তাঁর বিশ্ব সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে দিয়েছিলেন। মোজেসের সক্রিয় স্বভাব একটা নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা করল, একটা নতুন গোষ্ঠী খুঁজে নেওয়ার কথা ভাবল, যাদের

তিনি তাঁর নতুন ধর্ম দেবেন যে ধর্মকে ইজিপ্ট অবজ্ঞা করল। এটা ছিল নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যাতে ইখ্‌নাতনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে যে ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল, তার দুমুখো ক্ষতিপূরণ হয়। হয়ত, ওই সময়ে তিনি সেই সীমান্ত প্রদেশের (গোসেন) শাসনকর্তা ছিলেন যেখানে হয়ত ইতিমধ্যেই "হিকসোস্-এর সময়ে" কোনো সেমিটিক জাতি বসতি করছিল। এদেরই তিনি তাঁর নতুন প্রজা হিসেবে বেছে নিলেন। একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

উনি ওদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন, নিজেকে ওদের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে ইজিপ্ট থেকে অভিনিষ্ক্রমণ পরিচালনা করলেন। বাইবেলীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই নিষ্ক্রমণ শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয়েছিল এবং এদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়নি। মোজেসের কর্তৃত্বই এটাকে সফল করেছিল, এবং সেই সময় এমন কেন্দ্রিয় শাসন-ক্ষমতা ছিল না, যা এটা রোধ করতে পারত।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী, ইজিপ্ট থেকে এই অভিনিষ্ক্রমণ হয়েছিল ১৩৫৮ খ্রিঃ পূঃ থেকে ১৩৫০ খ্রিঃ পূঃ-এর মধ্যে অর্থাৎ ইখ্‌নাতন এর মৃত্যুর পর এবং হারেমহাব দ্বারা রাজ্যের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে। এই ইজিপ্ট ত্যাগ করে চলে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল একটাই জায়গা, ক্যানান। ইজিপ্টের সার্বভৌমত্ব ভেঙে পড়ার পর আরাম (সিরিয়া) নিবাসী যুদ্ধ পিপাসু দুর্বৃত্তরা দলে দলে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, যুদ্ধে জয়ী হয়ে আর যথেচ্ছ লুটতরাজ চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, সামর্থ্য থাকলে নতুন দেশ অধিকার করা যায়। ধ্বংস-প্রাপ্ত অমর্না শহরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত চিঠিগুলি ১৮৮৭ সালে পাওয়ার পর আমরা তার থেকে এই যোদ্ধাদের সম্বন্ধে জানতে পারি। ওই চিঠিগুলিতে এদেরকে বলা হয়েছিল হাবিরু, এবং এই নাম পরবর্তীকালে– কেউ জানেনা কেমন করে ইহুদি আক্রমণকারীদের ওপর এসে যায়। তারা ছিল হিব্রু এবং অনেক পরে তারা এসেছিল, কাজেই অমর্নার চিঠিগুলোতে এদের কথা বলা হতেই পারে না। ইজিপ্ট-ত্যাগী ইহুদিদের খুব কাছের সম্পর্কিত একটা উপজাতিও প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে– ক্যানানে, বসবাস করত।

এই অভিনিষ্ক্রমণের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল বলে আমরা অনুমান করি, তার মধ্যে সুন্নৎ-এর বিধিগত ব্যাপারটাও আছে। আমরা জানি যে, এই প্রাচীন প্রথার প্রতি মানুষের ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবেও, কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়, যে প্রথাটি প্রায় অবোধ্য। যারা এই প্রথা মানে না, তারা এটাকে একটা কুৎসিৎ, জঘন্য, ঘৃণার্হ প্রথা বলে মনে করে, আর যারা সুন্নৎ পালন করে, তারা এর জন্যে গর্বিত। এরা নিজেদের উচ্চতর, মহান ভাবে এবং অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে, তাদের অপরিচ্ছন্ন মনে করে। এমনকি, আজকের দিনেও, তুর্কীরা খ্রিস্টানদের "সুন্নৎ-না-করা কুকুর" বলে গাল দেয়। এটা লক্ষণীয় যে, মোজেস

নিজে ইজিপ্‌শিয়ান ছিলেন বলে সুন্নৎ হয়েছিলেন এবং একই মনোভাব পোষণ করতেন। যে ইহুদিদের সঙ্গে নিয়ে উনি তাঁর নিজের দেশ ত্যাগ করেছিলেন তারা, যে ইজিপ্‌শিয়ানদের উনি ফেলে এসেছিলেন, তাদের চেয়ে ভালো প্রতিকল্প হিসাবে জায়গা করে নেবে। কোনো অবস্থাতেই এদের ইজিপ্‌শিয়ানদের চাইতে নীচস্থ হওয়া চলবেনা। উনি চেয়েছিলেন, এদেরকে একটা "পবিত্র জাতি"-তে পরিণত করতে– বাইবেলে এটা স্পষ্ট বর্ণনা করা আছে– এবং তাদের আনুগত্যের চিহ্ন হিসাবে তিনি এই প্রথাটি প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে এরা অন্ততঃ ইজিপ্‌শিয়ানদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই প্রথা পালন করার ফলে এরা অন্যান্য বিদেশী জাতির, যাদের সঙ্গে এদের দেখা হবে, ঘোরাফেরা হবে, তাদের থেকে আলাদা থাকবে, যেমন ইজিপ্‌শিয়ানরাও সমস্ত বিদেশীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত।

ইহুদি ঐতিহ্য, অবশ্য পরবর্তীকালে এমন ভাব দেখাল যেন, এতক্ষণ ধরে আমরা যে ধারণাগুলো পরপর বিকশিত করে গেলাম, সেগুলো তাদের পীড়িত করেছে। মোজেস যে সুন্নৎ-এর প্রথা প্রবর্তন করলেন, সেটা যে একটা ইজিপ্‌শিয়ান প্রথা এটা মেনে নেওয়া মানে, মোজেস তাদের যে ধর্ম দিয়েছিলেন, সেটাও ইজিপ্‌শিয়ান ধর্ম, এই কথাটাও মেনে নেওয়া। কিন্তু ইহুদিরা সঙ্গত কারণেই এই ব্যাপারটা অস্বীকার করে। সুতরাং, সুন্নৎ-এর ব্যাপারেও যা সত্য, তারও বিরোধিতা করতে হয়েছিল।

৪.

এইবারে বোধ হয় একটা ভর্ৎসনা শুনবার সময় হয়েছে যে, আমি আমার যে সিদ্ধান্তগুলো তৈরি করেছি– যাতে ইজিপ্‌শিয়ান মোজেসকে ইখ্‌নাতন-এর সময়কালে দেখানো হয়েছে– সেই সময়ে ইজিপ্টে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল, তার ফলে মোজেসের ইহুদি জাতিকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর লোকদের তিনি যে ধর্মটি দিয়েছিলেন, সেটি ছিল আসলে আটন ধর্ম, যেটি ইজিপ্টে সেই সময়েই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল– সেগুলি একেবারে নিশ্চিত সত্য বলে ধরে নিয়েছি, যার কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। আমার মনে হয়, এই ভর্ৎসনা করাটা সঠিক হবে না। আমি শুরুতেই একটা সংশয়ের ব্যাপার আছে বলেছি, একটা বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্নও রেখেছি। কাজেই এই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-র ব্যাপারটা বার বার না বললেও চলবে।

আমার কিছু গুরুতর পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আমাদের মতবাদের কেন্দ্রবস্তু, ইহুদি একেশ্বরবাদের ইজিপ্‌শিয়ান ইতিহাসের একেশ্বরবাদী অধ্যায়ের ওপর নির্ভরতা, অনেক লেখকই অনুমান করেছিলেন এবং আভাসও দিয়েছিলেন। এখানে তাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই,

কারণ এদের মধ্যে কেউই, এই প্রভাব কীভাবে এসেছিল, তা বলতে পারেননি। আমি যেমন বলছি, এটা মোজেসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছিল, তাহলেও আমাদের অন্য সম্ভাবনার কথাও বিচার করতে হবে। এটা ধরে নিলে চলবেনা যে, সরকারিভাবে, আটন ধর্মকে ছুড়ে ফেলে ইজিপ্টে একেশ্বরবাদের দিকে প্রবণতাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। ওন্-এর পুরোহিত সম্প্রদায়, যেখান থেকে এই ধর্মটা উঠে এসেছিল, বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছিল এবং ইখ্নাতনের পরবর্তী পুরো প্রজন্মকে নিজেদের ধর্মের আওতায় নিয়ে আসতে পারত। অতএব, মোজেস নিজেই যে এই কর্মটি করেছিলেন, সেটা ভাবাই যায়, এমনকি যদি ইখ্নাতন-এর সময়কালে না-ও থেকে থাকেন, অথবা তার ব্যক্তিগত প্রভাবের আওতায় না-ও এসে থাকেন, যদি উনি কেবলমাত্র একজন ধর্মানুগত বা ওন্-এর পুরোহিত সম্প্রদায়ের সদস্য হন। এই অনুমান অভিনিষ্ক্রমনের তারিখটা কিন্তু পিছিয়ে আনবে এবং প্রচলিত যে সময়টার কথা ভাবা হয়, তার কাছাকাছি নিয়ে আসবে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী; এছাড়া এটা আর কিছুই সুপারিশ করতে পারে না। আমাদের তাহলে, মোজেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি, তা বিসর্জন দিতে হবে এবং ইজিপ্টের অরাজকতার সুযোগে যে অভিনিষ্ক্রমণ হয়েছিল, এই ধারণাটাও বাদ দিতে হবে। ইখ্নাতন-এর পরে উনবিংশ রাজবংশের রাজারা দেশটাকে শক্ত হাতে শাসন করেছিল। অভিনিষ্ক্রমণের অনুকূলে সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থাগুলি সেই প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত সময়টাতেই মিলে গিয়েছিল।

ইহুদিদের বাইবেলের বাইরেও একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে, যেখানে অনেক পৌরাণিক কাহিনীর এবং কুসংস্কারের জাল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের প্রথম নেতার এবং তাদের ধর্মের প্রবর্তকের মহান অস্তিত্বের চারপাশে বোনা হয়েছে এবং সেই অস্তিত্বকে একদিকে যেমন দীপ্তিময় করেছে, অন্যদিকে তেমনি অস্পষ্ট করে তুলেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর প্রথম পাঁচটা বইয়ের মধ্যে উল্লেখ না পাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের কিছু কিছু অংশ, এই ইহুদি সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকতে পারে। এইরকম একটি কাহিনী বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে মোজেস, তাঁর শিশুকালেই কীরকম উচ্চাশা পোষণ করতেন, সেই কথা। ফারাও একদিন যখন মোজেসকে কোলে নিয়ে খেলাচ্ছলে ওপর দিকে ছুড়ে লোফালুফি করছিলেন, তখন সেই তিন বছরের শিশু মোজেস ফারাও-এর মাথা থেকে মুকুটটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিয়েছিলেন। রাজা এটাকে অশুভ সংকেত ভেবে চমকে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানী পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। আবার আমাদের এটাও বলা হয়েছে যে, ইথিওপিয়াতে একজন ইজিপ্শিয়ান ক্যাপ্টেন হিসেবে লড়াই করে মোজেস যুদ্ধ জয় করেছিলেন এবং এই সুবাদেই তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, কারণ রাজ-পারিষদদের কিছু

অংশ অথবা ফারাও নিজেও মোজেসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, সেই ভয়টাও মোজেসের ছিল। বাইবেলের কাহিনীতেও মোজেসের সম্বন্ধে কিছু কিছু বিশেষত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে, মোজেস ছিলেন খিটখিটে, মাথা-গরম লোক– একবার রাগের চোটে উনি একজন নিষ্ঠুর তত্ত্বাবধায়ককে মেরেই ফেলেছিলেন, কারণ সে একজন ইহুদি শ্রমিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, অথবা যখন তাঁর লোকেরা দলত্যাগ করছিল, তখন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়ে সিনাই পর্বতের ওপর তাঁকে দেওয়া টেবিলটা তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর নিজেই শেষ পর্যন্ত মোজেসকে, তাঁর কোনো একটি ধৈর্যহীন কাজের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন– কী ছিল সেই কাজ, সেটা আমাদের বলা হয়নি। যেহেতু এই রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষকে মহান বানাতে পারে না, কাজেই ব্যাপারটাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। আবার আমরা এই সম্ভাবনাও বাদ দিতে পারিনা যে, ইহুদিরা প্রথম দিকে ঈশ্বরের যে স্বরূপটা ভেবেছিল, তাতে নানারকম চারিত্রিক গুণাগুণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভূষিত করে তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, কঠোর, অপ্রশম্য বানিয়েছিল, সম্ভবতঃ মোজেস সম্বন্ধে তাদের যে স্মৃতি ছিল, তার থেকে; কারণ আসলে, ইনি একজন অ-দৃশ্য ঈশ্বর নন, মোজেস স্বয়ং, যিনি ইজিপ্ট থেকে তাদের নিয়ে চলে এসেছিলেন।

আরো একটা মোজেসের ওপর আরোপিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের আগ্রহ জাগায়। মোজেস নাকি "ধীরে কথা বলতেন"– অর্থাৎ তাঁর নিশ্চয়ই কথা বলতে কোনো অসুবিধা হত, তোতলামি ছিল– যার জন্যে উনি আরণ-কে (তাঁর ভাই বলা হত) ফারাও-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনার সময় সাহায্য করতে ডেকেছিলেন। এটা আবার একটা ঐতিহাসিক সত্য-ও হতে পারে, এবং এই মহান ব্যক্তিটির যে ছবি আমরা খাড়া করছি, সেই প্রচেষ্টায় একটা সাদর সংযোজন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটার আবার একটা অন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থও থাকতে পারে। বিবরণটি, একটু ঘুরিয়ে দেখলে, একটি ঘটনার কথা বলে যে, মোজেস অন্য একটা ভাষায় কথা বলতেন, এবং তাঁর সেমিটিক নব্য-ইজিপ্শিয়ানদের সঙ্গে কোনো দোভাষীর সাহায্য ছাড়া কথাবার্তা বলতে পারতেন না– অন্ততঃ তাদের সঙ্গে মেলামেশার প্রথম দিকে তো নয়ই। অতএব আমাদের মতবাদের সপক্ষে একটা নতুন সমর্থন পেলাম : মোজেস ইজিপ্শিয়ান ছিলেন।

মনে হচ্ছে, আপাতত আমাদের চিন্তাধারা সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে। মোজেস ইজিপ্শিয়ান ছিলেন, এই অনুমান, প্রমাণিত হোক বা না হোক, এর থেকে এই মুহূর্তে আর কিছু পাওয়া যাবে না। কোনো ঐতিহাসিকই মোজেস ও তাঁর অভিনিষ্ক্রমণের বাইবেলীয় বিবরণকে একটা পবিত্র পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না, যেটা নিজের প্রবণতার গরজে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বদলে দিয়েছিল। সেই ঐতিহ্য আদিতে কেমন ছিল, আমরা জানিনা।

এই বদলে দেওয়ার বা বিকৃত করার প্রবণতা কী ছিল, আমরা অনুমান করতে চাই, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জানা না থাকায় আমরা অন্ধকারেই পড়ে আছি।

আমাদের ঘটনার পুনর্নির্মাণ বাইবেলের কাহিনীর অনেকগুলো দৃষ্টি-আকর্ষক বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো জায়গা ছাড়তে পারেনা– দশটি মহামারী, লোহিত সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ করে যাওয়া, সিনাই পর্বতের ওপর আনুষ্ঠানিক অনুশাসন প্রদান– এগুলি আমাদের বিপথগামী করতে পারবেনা। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়ের শান্ত ঐতিহাসিক গবেষণার বিপক্ষে নিজেদের অবস্থান দেখলে, আমরা উদাসীন হয়ে থাকতে পারব না।

এই সব আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, যাদের মধ্যে এডুয়ার্ড মেয়ের মতো লোক রয়েছেন, বাইবেলীয় বিবরণীর একটা চূড়ান্ত বিষয়কে অনুসরণ করেন। তাঁরা একমত যে, ইহুদি উপজাতিটি, যেটি পরবর্তীকালে ইস্রায়েলের অধিবাসী হয়েছিল, কোনো এক সময়ে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এই ঘটনাটি ইজিপ্টেও ঘটেনি, কিংবা সিনাই উপদ্বীপের একটি পর্বতের পাদদেশেও ঘটেনি, এটা ঘটেছিল মেরিবাত-কাদেশ নামে একটা জায়গায়, একটা মরুদ্যান, যেটা প্রচুর ঝর্ণা ও কূপ সম্বলিত এবং সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব সীমান্ত আর আরবিয়ার পশ্চিম সীমান্ত-র মাঝখানে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণের একটি দেশে অবস্থিত। সেখানেই ওরা যাহ্ভে দেবতার পুজো শুরু করেছিল, খুব সম্ভব কাছাকাছি বসবাসকারী মিডিয়ানাইট্স-দের একটা আরব উপজাতির কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। অনুমান করা যায়, অন্যান্য প্রতিবেশী উপজাতিরাও ওই ঈশ্বরের অনুগামী ছিল।

যাহ্ভে অবশ্যই আগ্নেয়গিরির দেবতা ছিলেন। যদিও আমরা জানি যে, ইজিপ্টে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই এবং সিনাই উপদ্বীপের পর্বতগুলিও কখনও আগ্নেয় ছিল না। অন্যদিকে, যে সব আগ্নেয়গিরি পরবর্তীকালেও সক্রিয় ছিল, সেগুলিকে আরবিয়ার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর দেখা যায়। এদের মধ্যে কোনো একটি পর্বত নিশ্চয়ই সিনাই-হোরেব নামে পরিচিত ছিল, যেটা কিনা যাহ্ভে-র বাসস্থান বলে বিশ্বাস। বাইবেলের কাহিনীর পরবর্তীকালের সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, আমরা পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি– মেয়েরের মতে– ঈশ্বরের আদিম রূপ : তিনি একজন ভয়ংকর রক্ত পিপাসু দানব, যিনি রাত্রি বেলাতেই কেবল চলাফেরা করেন আর দিনের আলো পরিহার করেন।

এই নতুন ধর্মের জন্মের সময় মানবজাতি ও ঈশ্বরের মধ্যে সমন্বয়-সাধনকারীর নামই হচ্ছে মোজেস। তিনি মিডিয়ানাইট পুরোহিত জেথ্রো-র জামাতা ছিলেন এবং তার পশুপালন করার সময়েই স্বর্গীয় আহ্বান পান। জেথ্রো কাদেশ-এ গিয়ে মোজেস-এর সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে নির্দেশাদি দেন।

এডুয়ার্ড মেয়ের বলেন, এটা সত্যি যে, ইজিপ্টে দাসত্ব বন্ধন এবং ইজিপ্টের চরম বিপর্যয়-এর কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্য আছে, এটা তিনি কখনোই

অস্বীকার করেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি জানেন না যে, এই পরিচিত সত্য কোন সময়ের ঘটনা এবং এই ঘটনা নিয়ে কী করতে হবে। ইজিপ্‌শিয়ানদের কাছ থেকে শুধু সুন্নৎ-এর প্রথাটাকেই পাওয়া গেছে, এটাই তিনি স্বীকার করেন। আমাদের আগের আলোচনায় তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চান: প্রথমত: যোসুয়া জাতিকে সুন্নৎ-এর প্রথা গ্রহণ করতে বলেছিলেন "ইজিপ্টের কলঙ্ককে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে"; এবং দ্বিতীয়ত: হেরোডোটাস-এর বক্তব্য যে, প্যালেস্টাইনে, ফিনিশিয়ান্‌স (সম্ভবত: ইহুদিদের বোঝানো হচ্ছে) এবং সিরিয়ানস্‌ নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে, তারা এই সুন্নৎ-এর প্রথাটা ইজিপ্‌শিয়ানদের কাছে থেকেই শিখেছিল। কিন্তু মোজেস ইজিপ্‌শিয়ান, এই ব্যাপারটা তার মনঃপূত নয়। "যে মোজেসকে আমরা জানি, তিনি কাদেশ-এর পুরোহিতদের পূর্বপুরুষ ছিলেন; কাজেই এই ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল একজন বংশবৃত্তান্তের অতিকথার চরিত্র হিসেবে, একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে নয়।" কাজেই যাঁরা মোজেসকে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও (যারা ঐতিহ্যকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন, তারা ছাড়া) এই খালি জায়গাটা কিছু দিয়ে ভরাট করতে পারেননি, যখন ওঁকে তারা একজন বাস্তব ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন; মোজেস তাঁর জীবনে কী কী করেছিলেন বা ইতিহাসের গতিপথে তাঁর কী কী করার ছিল, সে সম্বন্ধে এদের কিছুই বলার নেই।

অন্যদিকে, মেয়ের, মোজেসের কাদেশ ও মিডিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের বলতে কখনোই দ্বিধা করেননি। "মিডিয়ানদের সঙ্গে এবং মরুভূমির পবিত্র স্থানগুলির সঙ্গে মোজেস কত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন..." "মোজেসের এই চেহারা কাদেশ-এর (মাসা ও মেরিবা) সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত; একজন মিডিয়ানাইট পুরোহিতের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্কে সম্বন্ধিত হওয়াটা ছবিটাকে সম্পূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে, অভিনিষ্ক্রমণের সঙ্গে যোগসূত্র এবং তার যৌবনের পুরো কাহিনী, একদম গৌণ ব্যাপার এবং মোজেসের জীবনের একটা অবিচ্ছিন্ন কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় এই রকম একটা পরিণতি।" মেয়ের আরো দেখলেন যে, মোজেসের যৌবনের কাহিনীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে বাদ দেওয়া হয়েছে। "মিডিয়ানের মোজেস এখন আর একজন ইজিপ্‌শিয়ান বা ফারাও-এর পৌত্র নন, একজন মেষপালক মাত্র, যার কাছে যাহ্‌ভে নিজেকে প্রকট করেছিলেন। দশ মহামারীর কাহিনীতে, তাঁর আগেকার সম্বন্ধগুলো আর উল্লেখ করা হয়নি, যদিও সেগুলোকে খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেত, এবং ইস্‌রায়েলী প্রথম-জন্মানো সন্তানকে হত্যা করার আদেশ, পুরোপুরি ভুলে যাওয়া হয়েছে। অভিনিষ্ক্রমণে এবং ইজিপ্‌শিয়ানদের ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে মোজেসের কোনো হাত নেই; এমনকি, তাঁর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। একজন নায়কের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেটা তাঁর বাল্যকালের কাহিনীতে আছে বলে ধরে নেওয়া

হয়েছে, সেগুলি কিন্তু পরবর্তীকালের মোজেসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; সেখানে উনি কেবল ঐশ্বরীয় মানুষ, অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে সক্ষম, আর যাহ্‌ভে-প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।"

আমরা এই মানসিক প্রভাবটা এড়াতে পারিনা যে, এই কাদেশ ও মিডিয়ান-এর মোজেস, যাঁকে প্রচলিতভাবে বলা হয়েছে যে, একটা পেতলের সাপের মূর্তি আরোগ্যলাভের দেবতা হিসাবে নির্মাণ করিয়েছিলেন, তিনি, আমরা যে মহিমান্বিত ইজিপ্‌শিয়ান মোজেস ব্যক্তিটিকে অনুমান করেছি, যিনি তাঁর অনুগামীদের এমন একটি ধর্ম দিয়েছিলেন, যা সমস্ত জাদুবিদ্যা ও ভোজবাজিকে ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করে, এই মোজেস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যক্তি। আমাদের ইজিপ্‌শিয়ান মোজেসের সঙ্গে মিডিয়ান মোজেসের ততখানিই তফাৎ, যতখানি তফাৎ বিশ্বজনীন দেবতা আটনের সঙ্গে পবিত্র পর্বতে অবস্থিত দানব যাহ্‌ভে-র। আর এখন, আমরা যদি আধুনিক ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্যের মধ্যে সত্য আছে বলে মেনে নিই, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মোজেস একজন ইজিপ্‌শিয়ান, আমাদের এই অনুমান থেকে যে সূত্রটি আমরা টানতে চেয়েছিলাম, সেটি বোধ হয় দ্বিতীয়বার ছিঁড়ে গেল। আর এই যে, এবারে ছিঁড়ল, মনে হচ্ছে এই সূত্রটি পুনরায় বাঁধা যাবে, এমন আশা আর নেই।

৫.

এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল। মেয়ের-এর পরে গ্রেসম্যান এবং অন্যান্যরা সেই চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন এটা প্রমাণ করতে যে, মোজেস ব্যক্তিটি কাদেশ-এর পুরোহিত সম্প্রদায়কে উৎকর্ষে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঐতিহ্য তাঁকে যশ খ্যাতি প্রদান করেছিল। ১৯২২ সালে আর্নস্ট্ সেলিন একটা আবিষ্কার করেছিলেন, যা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ধর্মগুরু হোসিয়া-র (অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে) একটি বইয়ে একটি ঐতিহ্যের অভ্রান্ত সূত্র পেয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা মোজেস-এর বিরুদ্ধে তাঁর একগুঁয়ে, অবাধ্য প্রজারা বিদ্রোহ করেছিল এবং তাতে মোজেসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। এবং সেই সঙ্গেই তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকেও পরিত্যাগ করা হয়। কেবলমাত্র হোসিয়া-র লেখাতেই এই ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে, তাই নয়; পরবর্তীকালের বেশির ভাগ ধর্মগুরুর লেখাতেও এই ঐতিহ্যের কথা পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে, সেলিন বলছেন, পরবর্তীকালে ত্রাতার আবির্ভাব সম্বন্ধে সমস্ত প্রত্যাশার ভিত্তি হচ্ছে এই লেখাগুলোই। ব্যাবিলোনিয়ান নির্বাসনের শেষ দিকে, ইহুদিদের মধ্যে একটি আশা জেগেছিল যে, যে লোকটাকে ওরা এত নির্দয়ভাবে মেরে ফেলেছিল, তিনি মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে আসবেন এবং তাঁর অনুতপ্ত প্রজাদের আবার নেতৃত্ব দেবেন– এবং হয়ত শুধু তাঁর নিজের প্রজাদেরই নয়– এবং তাদের চিরশান্তির দেশে নিয়ে

যাবেন। পরবর্তীকালের একটি ধর্মের প্রবর্তকের ভাগ্যের সঙ্গে এই রকম একটা সহজবোধ্য যোগসূত্র, আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের আওতার বাইরে।

স্বাভাবিকভাবেই, আমি ঠিক বলতে পারব না, সেলিন ধর্মগুরুদের প্রাসঙ্গিক লেখাগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে কিনা। যদি সে সঠিক হয়, তাহলে যে ঐতিহ্যকে সে চিনতে পেরেছে, তাকে ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা দিতেই পারি; কারণ এই ধরণের ব্যাপারগুলো তো আর রাতারাতি আবিষ্কৃত হয় না, আর এসব করবার কোনো বোধগম্য উদ্দেশ্যও নেই। আর এসব যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তাহলে এসব ভুলে যাওয়ার ইচ্ছাটা সহজেই বোঝা যায়। এই ঐতিহ্যের সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের গ্রহণ করার দরকার নেই। সেলিন ভেবেছিল যে, জর্ডানের পূর্ব দিকের দেশে শিট্টিম বলে একটা জায়গায় এই নৃশংস ঘটনাটা ঘটেছিল। আমরা এখন দেখব যে, এই যে এলাকাটা বেছে নেওয়া হয়েছে, এটা আমাদের যুক্তির সঙ্গে মেলে না।

সেলিনের কাছ থেকে এই অনুমানটা এখন আমরা নেব যে, মোজেসকে ইহুদিরাই খুন করেছিল এবং ওঁর প্রবর্তিত ধর্মটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। এতে ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রসূত বিশ্বাসযোগ্য ফলাফলগুলিকে অস্বীকার না করে, আমাদের যুক্তিসূত্রকে টেনে নিয়ে চলার সুবিধা হবে। কিন্তু অন্য বিষয়গুলোতে আমরা ঐতিহাসিকদের পরোয়া না করে স্বাধীনভাবে চলব এবং নিজেদের রাস্তা নিজেরাই তৈরি করে নেব। ইজিপ্ট থেকে যে অভিনিষ্ক্রমণ শুরু হয়েছিল, সেটাই আমাদের যাত্রারম্ভ থাকবে। মোজেস-এর সঙ্গে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সংখ্যায় লোক দেশ ছেড়েছিল। অল্পসংখ্যক লোক হলে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিটির ও তার মহান পরিকল্পনায় কোনো গুরুত্ব থাকত না। বিদেশে বসবাসকারী এই লোকগুলি এদেশে নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন ধরে ছিল এবং সংখ্যায় প্রচুর বেড়েছিল। আমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী হবনা, যদি আমরা অধিকাংশ গবেষকদের সঙ্গে একমত হই যে, পরবর্তীকালে যারা ইহুদি জাতি বলে পরিচিত হয়েছিল, তাদের একাংশই কেবল ইজিপ্টে দাসত্ব করার দুর্ভাগ্য সয়েছিল। অন্যভাবে বললে, ইজিপ্ট থেকে আসা এই জাতিটি পরবর্তীকালে, ইজিপ্ট ও ক্যানান-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে সব সম্পর্কিত জাতির লোক অনেকদিন ধরে বসবাস করছিল, তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এই মেশামেশির ফলে যে সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল যাদের ইস্রায়েলের অধিবাসী বলা হয়, তাদের বিকাশে নতুন প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করা হয়েছিল, যেটা সমস্ত উপজাতিগুলোর মধ্যে সর্বজনীন ছিল, যাহ্ভে-র ধর্ম; মেয়ের-এর মতে, মিডিয়ানাইটস-দের প্রভাবে কাদেশ-এ এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। তার পরেই এই সম্মিলিত জাতি নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে ক্যানান বিজয়-এর অভিযান করেছিল। মোজেস ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে যে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল, সেটা জর্ডান-এর পূর্বদিকের দেশে ঘটেছিল, এই তথ্যের সঙ্গে আগের তথ্যটা মেলে না, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এই জাতিগত মেলামেশার বহু পূর্বেই ঘটেছিল।

এটা নিশ্চিত যে, নানান ধরনের জাতি মিলে ইহুদি জাতি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য ছিল, তা নির্ভর করত এই বিষয়ের ওপর যে, কারা ইজিপ্টে অল্প সময়ের জন্যে বসবাসকারী ছিল এবং তারপরে তাদের কী হয়েছিল। এদিক থেকে দেখলে, আমরা বলতে পারি যে, ইহুদি জাতিটাই গড়ে উঠেছিল দুটি শাখার মিলনে আর এটা এই ঘটনার সঙ্গে মেলে যে, অল্প কিছুকালের রাজনৈতিক ঐক্যের পর জাতিটা আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়– ইস্রায়েল সাম্রাজ্য এবং জুডা সাম্রাজ্য। ইতিহাস এই ধরণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভালোবাসে, যেখানে পরবর্তী ঐক্য ভেঙে যায় আর পূর্ববর্তী বিভাজন আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর সবচেয়ে উল্লেখনীয় উদাহরণ– একটা সকলের জানা বিষয়– পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে, পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময়, যখন প্রায় একহাজার বছরের বিরতির পর, যাদের জার্মানিয়া বলা হত এবং যারা রোমান ছিল আর যে অংশটা বরাবর স্বাধীন ছিল, তাদের মধ্যে সীমান্তটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইহুদি জাতির মধ্যে অবশ্য আমরা আগেকার পরিস্থিতির এই রকম কোনো বিশ্বাসনীয় প্রতিরূপ প্রতিপন্ন করতে পারব না। ওই সুপ্রাচীন কালের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অনিশ্চিত যে, উত্তরের রাজ্য আদি বসবাসকারীদের গ্রহণ করে ছিল আর দক্ষিণের রাজ্য গ্রহণ করেছিল তাদের যারা ইজিপ্ট থেকে এসেছিল, এই ব্যাপারটাও আমরা অনুমান করতে পারি না; কিন্তু পরবর্তীকালের ভেঙে যাওয়া, এক্ষেত্রেও, পূর্ববর্তী ঐক্যের সঙ্গে যোগ ছিল না, তা হতে পারে না। প্রাক্তন ইজিপ্শিয়ানরা হয়ত অন্যদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু তারা সংস্কৃতিতে উচ্চ স্তরের ছিল, এটা প্রমাণিত। তারা পরবর্তীকালের জাতির বিকাশে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কারণ তারা নিজেদের সঙ্গে একটা ঐতিহ্য নিয়ে এসেছিল, যেটা অন্যদের ছিল না।

বোধহয়, তারা আরও কিছু এনেছিল, এমন কিছু, যেটা ঐতিহ্যের চাইতেও বেশি বাস্তব। ইহুদিদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সবচেয়ে বড় প্রহেলিকা ছিল লেভাইট-দের পূর্ব পরিচয়, ইস্রায়েলের বারোটি উপজাতির মধ্যে এরা ছিল একটি, লেভির উপজাতি বা বংশধর, কিন্তু কোনো ঐতিহ্যই একথা বলতে পারেনি যে, এই উপজাতি আদিতে কোথায় বসবাস করত, অথবা বিজিত ক্যানান রাজ্যের কোন্ অংশটা এদের বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরোহিতদের পদগুলি অধিকার করেছিল, অথচ তা সত্ত্বেও, এরা পুরোহিতদের চাইতে আলাদা ছিল। একজন লেভাইট মানেই পুরোহিত নয়; এটা জাতিগত নাম নয়। ব্যক্তি মোজেসের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থেকে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, মোজেসের মতো, একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অচেনা লোকেদের কাছে কোনো রক্ষীদল ছাড়াই যাবেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন, তাঁর করনিকদের, তাঁর পরিচারকদের। এরাই ছিল আদি লেভাইটস্। ঐতিহ্য বলে যে, মোজেস

ছিলেন একজন লেভাইট। এটা মনে হয়, আসল পরিস্থিতির একটা স্পষ্ট বিকৃতি: লেভাইটরা ছিল মোজেসের লোক। এই সমাধান কিন্তু আমি আগের প্রবন্ধে যা উল্লেখ করেছি, তার দ্বারা সমর্থিত: যে, পরবর্তীকালে আমরা কেবলমাত্র লেভাইটদের মধ্যেই ইজিপ্‌শিয়ান নাম দেখতে পাই। আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মোজেসের এই লোকেদের বেশ ভালো একটা অংশ, মোজেস এবং তার প্রবর্তিত ধর্মের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তার থেকে পার পেয়ে গেছিল। পরের প্রজন্মগুলিতে তারা সংখ্যায় বেড়েছিল এবং যাদের মধ্যে এরা বাস করত, তাদের সঙ্গে মিশে গেছিল। কিন্তু তারা গুরুর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করত এবং তার শিক্ষার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল। যাহ্‌ভের অনুগামীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়, এরা একটা প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের গঠিত করেছিল এবং অন্যান্যদের চাইতে উচ্চস্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল।

আমি একটা মতামত দিচ্ছি এবং এখন পর্যন্ত এটা কেবলমাত্র আমার মত যে, মোজেসের পতন ও কাদেশ-এ একটা ধর্মের প্রবর্তনের মাঝখানে দুটি প্রজন্মের জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে, হয়ত একটা শতাব্দী কেটে গেছে। আমি এটা নির্ণয় করবার কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছিনা যে, যেসব নতুন ইজিপ্‌শিয়ানরা, যারা ইজিপ্ট থেকে ফিরে এসেছিল, তাদেরকে আমি এই নামেই ডাকতে চাই এবং অন্য ইহুদিদের থেকে আলাদা করে দেখতে চাই, তারা তাদের রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাক্ষাৎ পেয়েছিল কিনা এবং সেটা তারা যাহ্‌ভে ধর্ম গ্রহণ করবার আগে হয়েছিল, না, পরে হয়েছিল। বোধহয় পরের ব্যাপারটাই ঠিক। যাইহোক, এতে চরম ফলাফল পাল্‌টে যাবে না। কাদেশ-এ যা ঘটেছিল, সেটা ছিল একটা আপস মীমাংসা, যাতে মোজেসের উপজাতিরা যে অংশগ্রহণ করেছিল, তা অভ্রান্ত।

এইখানে আবার আমরা সুন্নৎ-এর প্রথার কথা টেনে আনতে চাই, যেটা একটা বারবার উঠে আসা প্রাচীন প্রসঙ্গ– আমাদের বারবার কাজে এসেছে। এই প্রথাটি যাহ্‌ভে ধর্মে একটা আইনে পরিবর্তিত হয় এবং যেহেতু এটা ইজিপ্টের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত– তাই এই প্রথাটি গ্রহণ করা মোজেসের লোকদের একটা বিশেষ অধিকার বা সুবিধা দেওয়াটা সূচিত করে। তারা, অথবা, তাদের মধ্যে যারা লেভাইট ছিল তারা– এই পবিত্র হওয়ার চিহ্নকে ত্যাগ করতে চায়নি। তারা তাদের পুরোনো ধর্মের যতখানি পারে, বাঁচাতে চেয়েছিল এবং তার বিনিময়ে তারা নতুন দেবমূর্তিকে এবং মিডিয়ান পুরোহিতরা তার সম্বন্ধে যা প্রচার করেছিল, সব কিছু মানতে ইচ্ছুক ছিল। হয়ত, তারা এর ফলে আরও কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিল। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইহুদি ধর্মাচারে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা নিয়ে মিতাচারের আদেশ ছিল। যাহ্‌ভে নামটার বদলে তারা বলতো আদোনাই। এই বিধানটাকে আমাদের যুক্তিধারার মধ্যে সামিল করার লোভ হচ্ছে, কিন্তু এটা তো কেবলমাত্র একটা অনুমান। ঈশ্বরের নাম নেওয়া নিষিদ্ধ করার

ব্যাপারটা, সকলেই জানে, একটা প্রাচীন নিষিদ্ধকরণ প্রথা। এই জিনিষটা আবার কেন নতুন করে ইহুদি বিধানে আনা হয়েছিল, সেটা খুব পরিষ্কার নয়। এটা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, এটা কোনো নতুন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য করা হয়েছিল। এটা ধরে নেওয়ারও কোনো কারণ নেই যে, এই বিধানগুলি রীতিমত ধারাবাহিকভাবে পালন করা হত। যাহ্‌ভে শব্দটা ব্যক্তিগত দেবদেবীর নামে নাম রাখার ব্যাপারে প্রচুর ব্যবহার করা হত, যেমন য়োকানন, যেহু, যোসুয়া ইত্যাদি। তবুও এই নামের কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, বাইবেলের ব্যাখ্যায় হেক্সাটিউচ্-এর দুটো উৎস পাওয়া যায়। তাদেরকে জে এবং ই বলা হয়, কারণ একটি গ্রন্থ পবিত্র নাম যাহ্‌ভে ব্যবহার করে, অন্যটি ইলোহিম নামটা ব্যবহার করে; ইলোহিম, সত্যি কথা, আদোনাই নয়। কিন্তু আমরা এখানে একজন লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করব : "এই বিভিন্ন নামগুলি, মূলে যে আলাদা আলাদা দেবতা ছিলেন, তারই স্পষ্ট চিহ্ন।"

নতুন ধর্মটি প্রবর্তনের সময় কাদেশে যে একটা আপস মীমাংসা হয়েছিল, তার প্রমাণ হিসেবে সুন্নৎ প্রথার প্রতি আনুগত্যকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি আমরা জে এবং ই এই দুটো থেকেই এই আপসটা কী হয়েছিল, তা জানতে পারি; দুটো বর্ণনাই মিলে যায়, কাজেই এদের একটা সাধারণ উৎস নিশ্চয়ই ছিল, হয় লিখিত কোনো বিবরণী, অথবা মৌখিক কোনো পরম্পরা। মূল উদ্দেশ্যটি ছিল, নতুন দেবতা যাহ্‌ভের মহানত্ব এবং ক্ষমতা প্রমাণ করা। যেহেতু মোজেসের লোকেরা তাদের ইজিপ্ট থেকে অভিনিষ্ক্রমনের অভিজ্ঞতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল, সেইজন্য তাদের মুক্ত করার এই মহৎ কর্মটি সাধন করার কৃতিত্ব যাহ্‌ভেকেই দেওয়া হয়েছিল; এবং এই কর্মকান্ডটিকে এমন সব জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছিল, যা এই আগ্নেয়গিরির দেবতার দারুণ সব ক্ষমতার জাঁকজমক দেখাতে পারে, যেমন কিনা, ধোঁয়ার স্তম্ভ, যেটা রাত্রিবেলা আগুনের স্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছিল, অথবা একটা প্রবল ঝঞ্ঝা, যা সমুদ্রের জলকে দু'ভাগ করে দিয়েছিল, যাতে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ফিরে আসা জলের তোড়ে ডুবে মরেছিল। অভিনিষ্ক্রমণ এবং নতুন ধর্মের প্রবর্তন, এই দুটোকে সময়ের হিসাবে একদম কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে অস্বীকার করা হয়েছিল। বাইবেলে বর্ণিত মোজেসের দশ বিধান, পবিত্র পর্বতের পাদদেশে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গারের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছিল, কাদেশে নয়। এই বিবরণ অবশ্য মোজেস নামক ব্যক্তিটির স্মৃতির ওপর দারুণ অন্যায় করেছিল; আগ্নেয়গিরির দেবতা নয়, মোজেসই ইজিপ্ট থেকে তার অনুগামীদের মুক্ত করেছিলেন। কাজেই কিছু বিশেষ সুবিধা তো তাঁর প্রাপ্য এবং সেটা দেওয়া হয়েছিল মোজেসকে কাদেশে এনে ফেলে, বা, সিনাই হোরেব পর্বতে এনে ফেলে এবং তাকে মিডিয়ানাইট পুরোহিত বানিয়ে। পরে আমরা বিবেচনা করব, এই সমাধান কীভাবে অন্য একটা সাংঘাতিক জরুরী

প্রবণতাকে সন্তুষ্ট করেছিল। বলতে গেলে, এইভাবে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল : যাহ্‌ভে-কে মিডিয়াতে তাঁর পর্বত থেকে সুদূর ইজিপ্টে তাঁর হাত প্রসারিত করতে দেওয়া হয়েছিল, আর একই সময়ে মোজেসের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াকলাপকে কাদেশে এবং জর্ডানের পূর্বদেশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এভাবে, তিনি, আর যে ব্যক্তি পরবর্তীকালে একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মিডিয়ানাইট জেথ্‌রো-র যিনি জামাতা, তাঁরা দুজন একই ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন, এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তিনি নিজের মোজেস নামটিও দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য এই অন্য মোজেসের ব্যক্তিগত কিছুই জানিনা– প্রথম ইজিপ্‌শিয়ান মোজেস দ্বারা এই দ্বিতীয় মোজেস সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেছেন, কেবলমাত্র, সম্ভবতঃ বাইবেলে মোজেসের যে চারিত্রিক বর্ণনা আছে, তার মধ্যে যে সব পরস্পর-বিরোধীতা দেখা যায়, সেই সূত্রগুলি ছাড়া। তাঁকে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়েছে একজন কর্তৃত্বব্যঞ্জক, বদমেজাজি, এমনকি হিংস্র মানুষ হিসাবে অথচ তাঁর সম্বন্ধে এ-ও বলা হয়েছে যে, তিনি একজন অসাধারণ ধৈর্যসম্পন্ন এবং "নম্র ও ভদ্র" লোক ছিলেন। এটা পরিষ্কার যে, পরে বর্ণিত গুণগুলি ইজিপ্‌শিয়ান মোজেসের কোনো কাজেই আসত না, যে মোজেস কিনা তাঁর অনুগামীদের জন্য এই রকম একটা বিশাল এবং কঠিন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন। হয়তো ওই গুণগুলি ওই অন্য মিডিয়ানাইট মোজেসের ছিল। আমার মনে হয়, এই দুই ব্যক্তিকে, একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করার ব্যাপারে এবং ইজিপ্‌শিয়ান মোজেস যে কখনও কাদেশে ছিলেন না এবং কখনও যাহ্‌ভে-র নামই শোনেননি, এটা ধরে নেওয়ার ব্যাপারে আমরাই সঠিক; মিডিয়ানাইট মোজেস কখনও ইজিপ্টে পদার্পণ করেননি এবং আটন সম্বন্ধেও কিছুই জানতেন না। এই দুই আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি বানানোর জন্য প্রচলিত কাহিনী বা ঐতিহ্যকে ইজিপ্‌শিয়ান মোজেসকে মিডিয়ানে আনতে হয়েছে; এবং আমরা দেখলাম যে, এটার জন্য একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৬.

আমি ইস্‌রায়েলের জাতিদের একেবারে প্রাচীন ইতিহাস, অযথা এবং অযৌক্তিক নিশ্চয়তা দিয়ে পুনর্গঠন করেছি, এই নিন্দাবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি ভাবব না যে, এই সমালোচনা অত্যন্ত রূঢ়, কারণ আমার নিজের বিচারেও এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। জানি যে, আমার এই পুনর্গঠনের কিছু দুর্বল জায়গা আছে, কিন্তু কিছু শক্ত জায়গাও আছে। সব মিলিয়ে আমাদের এই কাজটা চালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমাদের সামনে বাইবেলের নথি রয়েছে যার মধ্যে মূল্যবান, না না, অমূল্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদি রয়েছে। এগুলো অবশ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত করা হয়েছে এবং কাব্যিক সৃষ্টি-প্রয়াসে অতিরঞ্জিত করা

হয়েছে। আমাদের কাজের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই এই রকম একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকৃতি অনুমান করতে পেরেছি। এই আবিষ্কার আমাদের পথ দেখাবে। এই ইঙ্গিতটির মধ্যে দিয়ে আমরা আরো এই রকম বিকৃতি খুঁজে বের করতে পারব। যদি এই ধরনের বিকৃতি চিনে ফেলার মতো উপযুক্ত কারণ আমরা পেয়ে যাই, তাহলে ঘটনার সত্যতা আমরা উদ্ঘাটন করতে পারব।

বাইবেলের ওপর যে নিবিড় গবেষণার কাজ চালানো হয়েছে, তাতে হেক্সাটিউচ্-মোজেসের পাঁচখানা বই আর যোসুয়া-র একখানা বই, (কারণ এখানে আমাদের আগ্রহের বিষয় হচ্ছে এই বইগুলি) কীভাবে লিখিত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে, সেটা দিয়েই আমাদের শুরু করা যাক। প্রাচীনতম উৎস বলে বিবেচিত হয় জে, অর্থাৎ দ্য যাহ্ভিস্টিক নামক বইটি, যার লেখকের মধ্যে একেবারে হালের গবেষকরা এব্জাতার নামে পুরোহিতকে খুঁজে পাচ্ছেন, যিনি রাজা ডেভিড্ এর সমসাময়িক ছিলেন। কিছুকাল পরে, ঠিক জানা নেই কতকাল পরে, তথাকথিত ইলোহিস্টিক বইটি উত্তরের রাজ্যে আসে। ওই রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর, ৭২২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, একজন ইহুদি পুরোহিত জে এবং ই এই দুটো খন্ডকে একত্রিত করেন এবং তার সাথে নিজের রচনাও যোগ করেন। তাঁর এই সঙ্কলন গ্রন্থকেই জে ই বলা হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ডিউটেরোনমি নামক পঞ্চম বইটিও যোগ করা হয়, বলা হচ্ছে যে, এই সমগ্র গ্রন্থটি হাল আমলে টেম্পলে পাওয়া গেছে। টেম্পল ধ্বংস হওয়ার পরবর্তী সময়ে, ৫৮৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে, নির্বাসনের সময়ে এবং ফিরে আসার পরবর্তীকালে, একটা পুনর্লিখিত বই রাখা হয়েছিল, যার নাম ছিল পুরোহিত অনুশাসন। এই পঞ্চম শতাব্দীতে একটা নিশ্চিত বিন্যাস করা হয়েছিল এবং সেই সময়ের পরে এই রচনাগুলি আর মূলতঃ বদলানো হয়নি।

রাজা ডেভিড ও তার সময়কালের ইতিহাস খুব সম্ভব তারই সমকালীন কারো লেখা। এটাই হচ্ছে আসল ইতিহাস, হেরোডোটাস-এর পাঁচশো বছর আগে, "ইতিহাসের জনক"। আমার মতবাদ অনুযায়ী, যদি কেউ ধরে নেয় যে, এটা ইজিপ্শিয়ান প্রভাবেই সম্ভব, তবেই সে এটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকের ইস্রায়েলীরা, যারা মোজেসের পরিচারক, কর্মচারী ইত্যাদি ছিল, প্রথম অক্ষর আবিষ্কার করায় তাদের হাত ছিল। সেই প্রাচীন যুগের ঘটনাবলীর বর্ণনার উৎস কী, বা শুধু মুখে মুখে চলে এসেছে এবং কোনো ঘটনা ঘটার এবং তার বিবরণ লিখে রাখার মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান, আমরা স্বভাবতই তা জানি না। তবে বর্তমানে যে লিখন আমাদের হাতে আছে, সেগুলি তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলে। দুটো পৃথক শক্তি, পরস্পরের একেবারে বিপরীত, তাদের চিহ্ন এই সব বিবরণীতে রেখে গেছে। একদিকে, কিছু কিছু রূপান্তর কাজ করেছে, গোপন অভিসন্ধি নিয়ে বিবরণগুলিকে বিকৃত করে, মিথ্যা বিবরণ লিখে, এমন করে ফেলেছে, যাতে

আদিতে যা ছিল, তার ঠিক উল্টো অর্থ হয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রশ্রয়দাত্রী করুণা কাজ করেছে, প্রতিটি লিখন যেমন ছিল, তেমনি অবিকৃত রাখার জন্য উদ্বিগ্ন, বর্ণনাগুলি একে অপরকে সমর্থন করছে, না কি, একে অপরকে অস্তিত্বহীন বানিয়ে তুলছে, তার প্রতি উদাসীন। এইভাবে, এই বিবরণীগুলিতে সর্বত্রই দেখা যাবে, জ্বলন্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, গোলমেলে পুনরাবৃত্তি, পরিষ্কার পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা, এই রকম এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, যা পড়েই মনে হয়, এসব কথা কখনোই পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর জন্য লেখা হয়নি। রচনার এই বিকৃতি প্রায় খুন করার সমগোত্রীয়। কাজটা করা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু তার চিহ্ন লোপাট করাটাই কঠিন। এই 'বিকৃতি' কথাটার দু'রকম অর্থ দিতে ইচ্ছা করে, কথাটার সত্যিই দু'রকম অর্থ হয় যদিও এখন আর সেভাবে প্রয়োগ হয় না। কথাটার অর্থ শুধু "চেহারা পাল্টে দেওয়া"ই নয়, "মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা" "অন্য জায়গায় নিয়ে রাখা" এ-ও হতে পারে। সেই কারণেই, অনেক রচনার বিকৃতিতে আমরা দেখি, গোপন করা বা পরিত্যক্ত কিছু বিষয় অন্য কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা আছে, যদিও চেহারাটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে এবং আদি যোগসূত্র থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। শুধু এই জিনিসগুলো খুঁজে বের করা সবসময়ে সহজ নয়।

এই তথ্যাদি বিকৃত করার যে প্রবণতা আমরা খুঁজে বের করতে চাইছি, তা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার আগে নিশ্চয়ই তদানীন্তন ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছিল। এগুলোরই একটি, বোধ হয় সবচেয়ে যেটি শক্তিশালী, সেটি আমরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমি আগে বলেছিলাম যে, যখন কাদেশ-এ নতুন দেবতা যাহ্‌ভে-কে প্রবর্তন করা হয়, তাঁকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছিল। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হয়ে পড়েছিল, তাঁর জন্যে জায়গা করে দেওয়ার এবং আগের ধর্মের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার দরকার হয়ে পড়েছিল : যে জাতি ওখানে আগে থেকেই বসবাস করত, তাদের ধর্মের ওপর এটা সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছিল এবং তাদের আগের আচরিত ধর্মের সম্বন্ধে আর কোনো কথা শোনা যায়নি। কিন্তু যে জাতিটা ওখানে ফিরে এসেছিল, তাদের ওপর এটা করা সহজ ছিল না। ওরা ইজিপ্ট থেকে অভিনিষ্ক্রমণের ব্যাপারটা, মোজেস-এর কথা এবং সুন্নৎ-এর প্রথা, এসব থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প ছিল। এটা সত্যি যে, তারা ইজিপ্টে ছিল, কিন্তু সেখান থেকে আবার চলেও এসেছিল এবং তারপর থেকে যাবতীয় ইজিপ্‌শিয়ান প্রভাবের চিহ্ন অস্বীকার করার প্রয়োজন হয়েছিল। মোজেস-কে তো মিডিয়ান ও কাদেশে সরিয়ে দেওয়া হল এবং তাকে যাহ্‌ভে-ধর্ম যে প্রবর্তন করেছিল, সেই পুরোহিতের সঙ্গে এক করে দেওয়া হল। সুন্নৎ, যেটা কিনা ইজিপ্টের ওপর নির্ভরতার অকাট্য প্রমাণ ছিল, তাকে রাখতেই হবে, কিন্তু যাবতীয় বর্তমান প্রমাণ সত্ত্বেও, এই প্রথাটার সঙ্গে ইজিপ্টের যোগ অস্বীকার করার সমস্ত রকম চেষ্টা করা হয়েছিল।

"অভিনিক্রমণ"-এর মধ্যে যে হেঁয়ালি-ভরা পরিচ্ছেদটা ছিল, যেটা একটা প্রায় অবোধ্য শৈলীতে লেখা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, মোজেস সুন্নৎ প্রথাটাকে অবহেলা করেছিলেন বলে ঈশ্বর মোজেসের ওপর যারপরনাই রুষ্ট হয়েছিলেন এবং তার মিডিয়ানাইট স্ত্রী ঝট্‌পট্ অস্ত্রোপচার করে তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ইচ্ছাকৃত অপলাপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা শিগগিরই আরো একটা আবিষ্কারের কথায় আসব, যাতে একটা অসুবিধাজনক প্রমাণকে অসিদ্ধ প্রমাণ করা যায়।

এটা কোনো নতুন প্রবণতা নয়, এটা একটা পুরোনো প্রবণতারই অনুবৃত্তি মাত্র। যখন আমরা দেখি একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে যাহ্‌ভে যে একজন নতুন দেবতা এবং ইহুদিদের কাছে অপরিচিত বিদেশী, এটা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায়। এই কারণে, অব্রাহাম, আইজ্যাক, এবং জ্যাকব ইত্যাদি গোষ্ঠীপতিদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। যাহ্‌ভে বলেন যে, তিনি এই সব প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদেরও দেবতা ছিলেন; যদিও এটাও সত্যি এবং তিনি নিজেও তা মানেন যে, তাঁরা ওঁকে এই নামে পুজো করতেন না।

উনি অবশ্য বলেননি, অন্য কোন্ নামে তাঁকে পুজো করা হত। আর এই জায়গাতেই, সুন্নৎ-প্রথার ইজিপ্‌শিয়ান উৎসের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। বলা হয় যে, যাহ্‌ভে নাকি এটা আগেই অব্রাহামের কাছে দাবী করেছিলেন, তাঁর এবং অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে চুক্তির প্রতীক হিসাবে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা। যদিও, এটা অত্যন্ত বেখাপ্পা একটা যুক্তি। যদি কেউ একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করে চিনবার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সে এমন একটা চিহ্ন খুঁজে নেবে, যেটা অন্য কারো নেই– নিশ্চয়ই এমন কোনো চিহ্ন নয়, যা লক্ষ লক্ষ লোক দেখাতে পারে। একজন ইস্‌রায়েলী যদি ইজিপ্টে থাকে, তাহলে সমস্ত ইজিপ্‌শিয়ানকেই ভাই বলে ভাবতে হবে, একই চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ, যাহ্‌ভে-ভাই। সুন্নৎ প্রথা যে ইজিপ্‌শিয়ানদের একটা আদিম প্রথা, এই তথ্যটা ইস্‌রায়েলিদের নিশ্চয়ই অজানা ছিলনা, যারা বাইবেলের কাহিনী সৃষ্টি করেছে। এডুয়ার্ড মেয়ের উদ্ধৃত যোসুয়া-র পরিচ্ছেদে এটা স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে কোনো মূল্যে এই সত্যকে অস্বীকার করতেই হবে।

এই সব ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলো যে যুক্তিগ্রাহ্য যোগাযোগ সূত্রের দিকে সতর্ক মনোযোগ দেবে, সেটা আমরা আশা করতে পারি না। নইলে, একজন দেবতা, যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গোষ্ঠীপতিদের সঙ্গে চুক্তি করে এবং তারপরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁর মানব অংশীদারদের অবহেলা করে, যতক্ষণ না হঠাৎ তাঁর মনে হয় যে আবার তাদের বংশধরদের সামনে আত্মপ্রকাশ করা দরকার– এই সব দেখে যুক্তিযুক্ত ভাবেই মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়ার ব্যাপারটা থেকেই যায়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এটা এমন একটা

দেবতার কল্পনা যিনি 'হঠাৎ' একদল লোককে পছন্দ করে তাদের নিজের অনুগামী বানালেন আর নিজেকে তাদের দেবতা বানালেন। আমার বিশ্বাস, মানুষের ধর্মের ইতিহাসে এটাই এ ধরণের একমাত্র উদাহরণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে, মানুষ এবং তাদের দেবতা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে; শুরু থেকেই তারা এক। এটা সত্যি যে, কখনও কখনও আমরা শুনতে পাই, মানুষ অন্য দেবতাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এরকম কখনও শুনিনি যে, দেবতা নতুন অনুগামীদের খুঁজে নিয়েছে। যখন আমরা মোজেস এবং ইহুদি জাতির মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে ভাবব, তখন হয়ত, এই রকম অনন্য ঘটনার বিষয়ে বুঝতে পারব। মোজেস ইহুদিদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাদের নিজের অনুগামী বানিয়েছিলেন: ওরা ছিল তাঁর "পছন্দের লোক"।

নতুন যাহ্‌ভে ধর্মের মধ্যে গোষ্ঠীপতিদের আনার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা ক্যানান-এ বাস করতেন; তাঁদের স্মৃতির সঙ্গে সেই জায়গার কিছু কিছু এলাকার সম্বন্ধ ছিল। হয়ত তাঁরা নিজেরাই ক্যানান-এর নায়ক ছিলেন অথবা স্থানীয় পূজ্য দেবতা ছিলেন, যাঁদের বহিরাগত ইস্‌রায়েলিরা তাদের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে সামিল করে নিয়েছিল। তাঁদের নাম দিয়ে এরা হয়ত প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, এরা এই দেশেই জন্মেছে, এখানেই বড় হয়েছে, বংশবিস্তার করেছে এবং এভাবেই হয়ত, বিদেশী বিজেতার প্রতি যে ঘৃণার জন্ম হয়, সেটা রোধ করতে চেয়েছিল। খুব চতুর একটা পন্থা; দেবতা যাহ্‌ভে তাদের পূর্বপুরুষদের যা ছিল, কেবল সেটাই তাদের দিয়েছিলেন।

বাইবেলের মূল পাঠের পরবর্তী সংযোজনগুলোতে কাদেশ-এর উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা সফল হয়েছিল। নতুন ধর্ম প্রবর্তনের জায়গাটা নিশ্চিতভাবেই সিনাই-হোরেব-এর পবিত্র পর্বত ছিল। এর উদ্দেশ্য অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না; হয়ত, তারা মিডিয়ানদের প্রভাবের কথা মনে পড়ে যাক এটা চাইছিল না। কিন্তু পরবর্তী সমস্ত বিকৃতি, বিশেষ করে যাবতীয় নিয়মাবলী, অন্য আরেকটা উদ্দেশ্য সাধন করে। দীর্ঘদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণগুলিকে অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না: সেটা বহু আগেই করা হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে, বর্তমান কালের কিছু অনুশাসন এবং প্রতিষ্ঠানকে বহু প্রাচীন কালের ছাপ দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, মোজেইক অনুশাসনের নিয়মাবলী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে এবং তার থেকেই পবিত্রতা এবং বন্ধন ক্ষমতার প্রতি এগুলির দাবীকেও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এইভাবেই প্রাচীন কালের ছবিটাকে যত বেশি মিথ্যার আবরণে ঢাকা দেওয়া হোক না কেন, যেভাবে সেটা করা হয়েছিল, তাতে অবশ্য কিছু মনস্তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়েছিল। এতে বোঝা যাচ্ছিল যে, বহু শতাব্দী ধরেই-অভিনিষ্ক্রমণ এবং এজ্‌রা ও নেহেমিয়া কর্তৃক বাইবেলের পাঠ লেখার মাঝখানে আটশো বছর পার হয়ে গিয়েছিল– যাহ্‌ভের ধর্ম একটা পশ্চাদ্‌গামী

বিকাশ অনুসরণ করছিল, যেটা শেষ পর্যন্ত মোজেসের আদি ধর্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল (এমনকী হয়ত, আসল পরিচিতিও একই হয়ে গিয়েছিল)।

এবং এটাই হচ্ছে একান্ত ফলশ্রুতি: ইহুদিদের ধর্মের ইতিহাসের নির্দিষ্ট পরিণতি।

৭.

ইহুদিদের প্রাক্-ইতিহাস, যা পরবর্তী যুগের কবিরা, যাজকেরা, এবং ঐতিহাসিকেরা বিবৃত করেছেন, তার সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট ঘটনা ছিল, যেটাকে খুব স্পষ্ট ও মহান মানবিক উদ্দেশ্যে গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে, মহান নেতা ও মুক্তিদাতা মোজেসের হত্যা, যেটা সেলিন, ধর্মযাজকদের দেওয়া কিছু সূত্র অনুধাবন করে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন। সেলিনের এই অনুমানকে মোটেই কল্পিত কাহিনী বলা যায় না। এটা যথেষ্ট সম্ভাব্য। ইখ্নাতন-এর বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোজেস, রাজা যেমন করতেন, সেই একই প্রণালী প্রয়োগ করতেন; তিনি হুকুম করতেন এবং নিজের ধর্মকে তাঁর লোকদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ত মোজেসের মতবাদ তাঁর গুরুর মতবাদের চাইতে আরো বেশি কঠোর, আপস বিরোধী ছিল; সূর্যদেবতার ধর্মের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র বজায় রাখার তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর বিদেশী অনুগামীদের কাছে ওন্-এর শিক্ষার কোনো গুরুত্বই ছিল না। ইখ্নাতন-এর ভাগ্যে যা ঘটেছিল, মোজেসের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল, আর সমস্ত বুদ্ধিজীবি স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষেত্রেও এই একই ভাগ্য অপেক্ষা করে থাকে। মোজেস-এর ইহুদি অনুগামীরা, অষ্টাদশ রাজবংশের সময়কার ইজিপ্শিয়ানদের মতো, এই অত্যন্ত উচ্চস্তরের আত্মিকবাদমূলক ধর্ম তাদের জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাতে কী কী সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে, সেটা বুঝতে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই, একই ব্যাপার ঘটেছিল: যাদের মনে হয়েছিল যে, তাদের ওপর অভিভাবকত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা যারা ভাবত যে, তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা বিদ্রোহ করেছিল, এবং তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ধর্মের বোঝা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু যেখানে, ভীরু ইজিপ্শিয়ানরা অপেক্ষা করত, যতদিন না তাদের ফারাও-এর পবিত্র শরীরটাকে অদৃষ্ট সরিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে বর্বর সেমাইট্-রা নিজেদের অদৃষ্ট নিজেদের হাতেই তুলে নিত আর তাদের অত্যাচারীকে নিজেরাই সরিয়ে দিত।

অথচ আমরা এ-ও বলতে পারব না যে, বাইবেলের যে কাহিনী আমরা সংরক্ষিত অবস্থায় পেয়েছি, মোজেসের এই রকম পরিনাম হবে, এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুত করেনি। "উষর জনহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো-"র কাহিনীটি– যেটি মোজেসের

শাসনকালের বলেই মনে হয়, তাতে মোজেসের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক বড় বড় বিদ্রোহের বর্ণনা আছে, যেগুলো যাহ্ভের হুকুমে নিষ্ঠুর শাস্তিবিধান করে দমন করা হয়েছিল। এটা কল্পনা করা সহজ যে, এইরকম একটা বিদ্রোহের অন্যরকম পরিণতি হয়েছিল, যা বাইবেলের রচনায় স্বীকার করা হয়নি। লোকেরা যে নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, সেটাও ওই রচনায় উল্লেখ করা আছে, যদিও একটা সাধারণ উপকাহিনী হিসাবে। সেটা হচ্ছে সেই সোনালী বাছুরের গল্প, যেখানে একটা দক্ষ মোচড়ে আইনের টেবিলটা ভেঙে ফেলার কথা আছে-যেটা প্রতীক হিসাবে বুঝতে হবে (="তিনি আইন ভেঙে ছিলেন")– সেটা মোজেস নাকি নিজেই করেছিলেন এবং তাঁর ক্রুদ্ধ ঘৃণার জন্যই এটা হয়েছিল।

পরে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন মানুষ মোজেসের হত্যার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল এবং সেটা ভুলতে চেয়েছিল। কাদেশ-এ সকলের একত্র হওয়ার সময় এটা অবশ্যই সত্য ছিল। অবশ্য যদি এই অভিনিষ্ক্রমণকে সময়ের পরিমাপে মরুদ্যানে তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠার সময়ের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় এবং যদি মোজেস্‌কে, অন্য প্রতিষ্ঠাতাকে নয়, এর সাহায্যকারী বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মোজেসের অনুগামীদের দাবীই শুধু সন্তুষ্ট হবে তাই নয়, মোজেসের নিষ্ঠুর হত্যার সেই যন্ত্রণাময় সত্যকেও সফলতার সঙ্গে অস্বীকার করা যাবে। বাস্তবে, কাদেশ-এর ঘটনাবলীতে মোজেস-এর অংশগ্রহণ করা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমনকি তাঁর জীবনকাল ছেঁটে না ফেললেও।

এইখানে আমরা ওই সব ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা বার করার চেষ্টা করব। ইজিপ্ট থেকে অভিনিষ্ক্রমণের ঘটনাটাকে আমি অষ্টাদশ রাজবংশের (১৩৫০ খ্রিঃ পূর্ব)-এর সমাপ্তির পর পরই হয়েছে ধরে নিয়েছি। ওটা ঘটেছিল হয় ওই সময়েই অথবা তার অল্প কিছু পরে, কারণ ইজিপ্‌শিয়ান ধারাবিবরণীর লেখকরা পরবর্তী অরাজকতার বছরগুলোকে রাজা হারেমহাব-এর রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই ধারাবিবরণীর সময়কাল ধার্য করতে পরবর্তী সাহায্য এবং এটিই একমাত্র পাওয়া যাচ্ছে মেরনেপ্‌তা (১২২৫-১২১৫ খ্রিঃ পূঃ)-এর প্রস্তর ফলক থেকে, যেটাতে ইসরাল (ইস্‌রায়েল)-এর ওপর বিজয়কে এবং তাদের বীজ (হুবহু অনুরূপ)কে ধ্বংস করাকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রস্তরফলকের মূল্য সন্দেহজনক; এটাকে শুধু প্রমাণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে যে, সেই সময়ে ইস্‌রায়েলি জাতি ইতিমধ্যেই ক্যানান এ বসতি স্থাপন করে ফেলেছে। মেয়ের এই প্রস্তর ফলকটি থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আগে যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, মেরনেপ্‌তা কিন্তু তেমন, অভিনিষ্ক্রমণের সময়ের ফারাও হতেই পারেন না। অভিনিষ্ক্রমণ তারও আগের কোনো সময়ের ঘটনা। অভিনিষ্ক্রমণের সময় কে ফারাও ছিলেন, এই প্রশ্নটা, আমার কাছে অবান্তর মনে হয়। সেই সময়ে কোনো ফারাও ছিলেন না, কেননা, অভিনিষ্ক্রমণটা ঘটেছিল, দুই শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়ে। কিন্তু মেরনেপ্‌তা প্রস্তর ফলক কাদেশে দুই জাতির মিলে যাওয়ার এবং নতুন ধর্ম

গ্রহণ করার সম্ভাব্য সময়কালের ওপর কোনো আলোকপাত করেনা। আমরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এগুলো ঘটেছিল ১৩৫০ এবং ১২১৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যে যে কোনো সময়ে। ধরে নেওয়া যাক, ওই শতাব্দীতে প্রথম তারিখটার কাছাকাছিই অভিনিষ্ক্রমণ ঘটেছিল, আর কাদেশের ঘটনাগুলো দ্বিতীয় তারিখটার থেকে বেশি দুরে নয়। এই সম্পূর্ণ সময়কালের বেশির ভাগ অংশই আমরা ওই দুই ঘটনার অন্তর্বর্তী সময় হিসাবে রেখে দেব। কারণ মোজেসের হত্যার পর সেই ফিরে আসা জাতির আবেগ প্রশমিত হওয়ার জন্য এবং মোজেস-অনুগামী লেভাইট্‌দের প্রভাব, কাদেশ এর আপস-মীমাংসায় যেটা প্রতীয়মান হয়, আরো শক্তিশালী হবার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় দরকার ছিল : দুই প্রজন্ম, ষাট বছর, যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু হয়ত! মেরনেপ্তা-র প্রস্তর ফলক থেকে অনুমিত তারিখটা বড় বেশি আগের তারিখ বলে মনে হয় এবং আমরা জানি যে, আমাদের প্রামাণ্য মতবাদে একটা অনুমান আরেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে, কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, এই আলোচনায় ঘটনা-নির্মাণে একটা দুর্বল স্থান পাওয়া যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্যানান্-এ ইহুদি জাতির স্থিতিশীল হয়ে বসবাস করার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুই যথেষ্ট অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিমূলক। অবশ্য আমরা এটা ভাবার একটা সুযোগ নিতে পারি যে, ইস্‌রায়েল প্রস্তরফলকে যে নামটা আছে, সেটা, আমরা যে জাতির ভাগ্যকে অনুসরণ করছি এবং যারা পরবর্তীকালে ইস্‌রায়েল জাতির মধ্যে একত্রিত হয়ে গেছে, তাদের কথা বলছে না। যাই হোক না কেন, হাবিরু (=হিব্রু) নামটা অমর্না-র সময় থেকে এই জাতিটার ওপরই তো চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন উপজাতি একই ধর্ম গ্রহণ করে একসাথে মিলে গিয়ে একটা জাতির সৃষ্টি করে, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। ঘটনাপ্রবাহে সেই নতুন ধর্ম আবার ভেসে গিয়েছিল এবং তখনকার পূর্বতন দেবতাদের মিছিলে যাহ্‌ভে-ও জায়গা করে নিয়েছিলেন, যেটা ফ্লবার্ট কল্পনা করে নিয়েছিলেন, এবং যাহ্‌ভে-র অনুগামীদের পুরো বারোটা উপজাতিই "হারিয়ে" গিয়েছিল, কেবলমাত্র দশটা উপজাতিই না, যাদের এতদিন ধরে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা খুঁজে বেরিয়েছে। এই যে দেবতা যাহ্‌ভে, যার কাছে মিডিয়ানাইট মোজেস নতুন অনুগামীদের নিয়ে গিয়েছিলেন, বোধ হয় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দেবতা ছিলেন না। একজন রূঢ়, সংকীর্ণমনা স্থানীয় দেবতা, হিংস্র এবং রক্ত পিপাসু, তিনি তাঁর অনুগামীদের "একটা দুধ ও মধু পূর্ণ দেশ" প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ও তাদের "তলোয়ারের আঘাতে" বর্তমান অধিবাসীদের সেই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বাইবেলের কাহিনীগুলো এতবার পাল্‌টানো সত্ত্বেও, এত কিছু সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে এই দেবতার আসল স্বভাব-চরিত্রটা আমরা জানতে পারি। এটা মোটেই নিশ্চিত নয় যে, তাঁর এই ধর্ম সত্যিকারের একেশ্বরবাদ, যে এই ধর্মের মধ্যে অন্য দেবতাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করা নিষিদ্ধ ছিল। বোধ হয় তাদের কাছে এটাই যথেষ্ট ছিল যে, নিজস্ব

দেবতা, অন্যান্য বিদেশী দেবতাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী। এই ধরনের শুরু থেকে ঘটনা যেদিকে যাবে বলে আশা করা যায়, ঘটনাক্রম যদি সেদিকে না গিয়ে সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নেয়, তাহলে তার পেছনে মাত্র একটাই কারণ হতে পারে। জাতির এক অংশকে ইজিপ্শিয়ান মোজেস ঈশ্বর সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আধ্যাত্মিক বোধ দিয়েছিলেন, একজন মাত্র ঈশ্বর যিনি সমস্ত পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, যিনি সকলকেই ভালোবাসেন এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, যিনি সবরকম বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং জাদুবিদ্যার প্রতি বিরূপ এবং একটি সত্য ও ন্যায়-এর জীবন, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিকতা, সেটাই ঠিক করে দিয়েছেন। কারণ, আটন-ধর্মের নৈতিক দিকটা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, এটা উল্লেখযোগ্য যে, ইখ্নাতন তাঁর উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে নিজেকে একজন "মাত্-এ বসবাসকারী" (সত্য, ন্যায়) বলে নিয়মিত বর্ণনা করেছেন। দীর্ঘকাল পরে এখন আর কিছুই যায় আসে না যে, লোকরা হয়ত অল্প কিছুদিন পরেই মোজেসের শিক্ষা পরিত্যাগ করেছিল এবং মোজেসকেও সরিয়ে দিয়েছিল। ঐতিহ্যটা কিন্তু রয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব– যদিও খুব ধীরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে– পৌঁছে গিয়েছিল সেই লক্ষ্যে, যা মোজেসকেও দেওয়া হয়নি। মোজেস যে তাঁর অনুগামীদের মুক্ত করে এনেছিলেন, সেটার কৃতিত্ব দেবতা যাহ্ভের ওপর চাপিয়ে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য নয় এমন সম্মান, কাদেশ-এ ও তার পরবর্তী সময়ে দেওয়া হয়েছিল: কিন্তু এই অন্যায় দখলদারিত্বের জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল। যে দেবতার জায়গা উনি নিয়েছিলেন, তাঁর ছায়া ক্রমশঃ তাঁর চেয়ে শক্তিশালী হতে থাকে; এবং সেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর তাঁকে ছাপিয়ে ভুলে যাওয়া মোজেইক ঈশ্বর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই অন্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বোধটাই ইস্রায়েলের লোকেদের, তাদের সমস্ত কষ্ট-দুর্দশা জয় করে আমাদের আজকের সময় পর্যন্ত টিকে থাকার প্রেরণা ছিল।

যাহ্ভের ওপর মোজেইক ঈশ্বরের এই চূড়ান্ত জয়ের ব্যাপারে লেভাইট্-রা কী অংশ গ্রহণ করেছিল, তা এখন আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যখন কাদেশ-এ আপস-মীমাংসা হয়, তখন তারা মোজেসের জন্যে গলা ফাটিয়েছিল, কারণ তাদের যে নেতার তারা স্বদেশবাসী এবং অনুগামী, তাঁর স্মৃতি তখনও ওদের মনে টাটকা ছিল। তারপরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লেভাইট-রা সম্পূর্ণ জাতির সঙ্গে অথবা পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছিল এবং পুরোহিতদের প্রধান কাজই হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় আচার আচরণগুলি বিকশিত করা এবং তত্ত্বাবধান করা, তাছাড়া পবিত্র গ্রন্থগুলির যত্ন নেওয়া এবং সেগুলির উদ্দেশ্য অনুযায়ী পুনর্বিচার ও সংশোধন করা। কিন্তু এই সমস্ত আত্মত্যাগ ও অনুষ্ঠানগুলির ভেতরে কি শেষ পর্যন্ত জাদুবিদ্যা এবং তুকতাক্ ছিল, যেটা মোজেসের মতবাদ সোজাসুজি নাকচ করে দিয়েছিল? সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে, তার মানে এই নয় যে কেবলমাত্র মোজেসের অনুগামীদের মধ্যে থেকে, এই মহান এবং শক্তিশালী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক

হিসেবে যে ঐতিহ্য অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, জন্ম নিয়েছিল অসংখ্য মানুষের মিছিল, তারা, অর্থাৎ সেই ধর্মপ্রবক্তারা, পুরোনো মোজেসের মতবাদকে পরিশ্রম করে প্রচার করেছিল; বলেছিল, দেবতা আত্মোৎসর্গ চাননা, আনুষ্ঠানিক জাঁকজমক চাননা; তিনি চান ভক্তের বিশ্বাস এবং সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে জীবনযাপন (মাত)। ধর্মপ্রবক্তাদের এই প্রচেষ্টা স্থায়ীভাবে সফল হয়েছিল; যে মতবাদ দিয়ে তারা পুরোনো বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল, সেগুলোই পরে ইহুদিধর্মের চিরস্থায়ী বক্তব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইহুদিদের এটা গর্ব যে, এরকম একটা ঐতিহ্যকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং তাদের মধ্যে থেকেই এমন ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা তাদের কণ্ঠস্বরও এতে মিলিয়েছিল, যদিও প্রথম উদ্দীপনা এসেছিল বাইরে থেকে, একজন মহান বিদেশির কাছ থেকে।

ঘটনাবলীর এই বর্ণনায় আমি একটু অনিশ্চিত বোধ করতাম যদি না অন্য দক্ষ গবেষকদের লেখা থেকে সাহায্য পেতাম, যে গবেষকরা ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে মোজেসের গুরুত্বকে একই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, যদিও তাঁর ইজিপ্‌শিয়ান উদ্ভব এরা মানেন না। সেলিন বলেন, উদাহরণ স্বরূপ– "কাজেই, মোজেস-এর আসল ধর্মকে আমরা এইভাবে দেখব, একজন নীতিবাদী, ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এখন থেকে সেটা এই জাতির ভেতরে একটা ছোট্ট চক্রের হস্তগত। প্রথম থেকেই এই বিশ্বাস যে জাতির ধর্মাচরণের মধ্যে, পুরোহিতদের ধর্মের মধ্যে বা জাতির মধ্যে এসে গিয়েছিল, সেটা আমরা আশা করতে পারিনা। আমরা যা আশা করতে পারি তা হচ্ছে এই যে, যে আধ্যাত্মিক আগুন তিনি জ্বালিয়েছিলেন, তার এক-আধটা স্ফুলিঙ্গ এখানে ওখানে ছিট্‌কে উঠতে পারে, যে, তাঁর মতবাদ নষ্ট হয়ে যায়নি, নীরবে বিশ্বাস এবং প্রথাগুলিকে প্রভাবিত করে গেছে, যতদিন না, বিশেষ কোনো ঘটনাপ্রবাহে অথবা এই বিশ্বাসে নিমজ্জিত কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে, এই মতবাদ আবার শক্তিশালী হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং অধিকাংশ লোকের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন ইস্‌রায়েলিদের গোড়ার দিকের ধর্মীয় ইতিহাসকে আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। যে ঐতিহাসিক নথিতে ক্যানান্‌-এর প্রথম পাঁচটি শতাব্দী-র ধর্মকে বর্ণনা করা হয়েছে, তার ধাঁচে যদি আমরা মোজেইক ধর্মকে পুনর্নির্মাণ করতে যাই, তাহলে আমাদের মস্ত বড় প্রনালীগত ভুল করা হবে।" ভল্‌জ্‌ আরো খোলাখুলিভাবে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "মোজেসের এই আকাশ-ছোঁয়া কার্যকলাপ প্রথম দিকে কেউ বোঝেইনি এবং খুব ক্ষীণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যতদিন না, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হওয়ার পর এটা লোকেদের মানসিকতায় বেশি বেশি করে ঢুকে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মহান ধর্মপ্রবক্তাদের মধ্যে স্বগোত্রীয় খুঁজে পেয়েছিল, যারা সেই একাকী ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

এইবার আমি সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছি, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইজিপ্‌শিয়ান মোজেসের ব্যক্তি-চরিত্রকে ইহুদি ইতিহাসের কাঠামোয় বসানো। এখন

আমি আমার উপসংহার খুব ছোট করে বলতে পারি: ওই ইতিহাসের অতি-পরিচিত যে দ্বিত্বগুলি– দুদল লোক মিশে গিয়ে একটা জাতি তৈরি হল, দুটো রাজ্যে এই জাতি বিভাজিত হল– বাইবেলের উৎসে দেবতার দু'টো নাম– আমরা আরো নতুন দু'টো যোগ করছি : দু'টো ধর্মের প্রবর্তন, প্রথম ধর্মটিকে দ্বিতীয়টি হঠিয়ে দিল, কিন্তু প্রথমটি আবার বিজয়ী হয়ে ফিরে এল, দু'জন ধর্মের প্রবর্তক, যাদের উভয়েরই একই নাম, মোজেস, এবং যাদের ব্যক্তিত্বকে আমরা পরস্পরের থেকে আলাদা করতে চাই। আর এই সমস্ত দ্বিত্ব, প্রথমটির পরিণতি; জাতির একটা অংশকে মর্মপীড়াদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছিল, যা অন্য অংশটিকে পেতে হয়নি। আরও কিছু রয়ে গেল আলোচনা করার, ব্যাখ্যা করার, প্রতিষ্ঠিত করার। শুধু তাহলেই আমাদের খাঁটি ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি আগ্রহ পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত হবে। একটা ঐতিহ্যের সহজাত চরিত্র কী, এবং এর বিশেষ ক্ষমতা কিসের মধ্যে থাকে, পৃথিবীর ইতিহাসের ওপর প্রতিটি মহান ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাব অস্বীকার করা কেমন অসম্ভব, মানুষের যে সব উদ্দেশ্য বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত, তাকে যদি আমরা একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মেনে নিই, তাহলে আমরা মনুষ্য জীবনের এই সমস্ত চমৎকার ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বিন্যাসকে কীভাবে অবজ্ঞা করি, কোন্ উৎস থেকে কিছু কিছু বোধ, বিশেষ করে ধর্মীয় বোধ শক্তি আহরণ করে, যার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতিকে বশ করা যায়– বিশেষ করে ইহুদিদের ইতিহাসে এই সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করাটা একটা লোভনীয় কাজ হতে পারে। আমার রচনার এই রকম অনুবৃত্তি পঁচিশ বছর আগে টোটেম অ্যান্ড টাবু বইটিতে লিখিত উপসংহারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। কিন্তু আমি আর নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করতে পারছিনা।

প্রারম্ভিক টীকা

১. মার্চ, ১৯৩৮ এর আগে লেখা (ভিয়েনা)

যার আর হারাবার কিছু নেই, তেমন লোকের মতো স্পর্ধা নিয়ে আমি আমার সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় বারের মতো বদলাতে চাই আর আমার মোজেসের ওপর লেখা দুটো রচনাকে (ইমাগো বিডি-২৩, হেফ্‌ট্ ১ এবং ৩) অনুসরণ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে চাই, যেটা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করিনি। শেষ রচনাটা লিখে শেষ করার পর আমি বলেছিলাম যে, এই কাজ শেষ করাটা আর আমার ক্ষমতায় কুলোবেনা। আমি অবশ্য আমার সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াকলাপের কথাই বলতে চেয়েছিলাম, যেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, কিন্তু অন্য আর একটা প্রতিবন্ধকতাও ছিল। আমরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সময়ে বাস করছি। আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, সভ্যতার উন্নতি বোধ হয় বর্বরতার সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে এতদিন পর্যন্ত যে দশকোটি লোককে দমন করে রাখা হয়েছিল, তাদের জীবন উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়ে তাদের ধর্ম নামক বেদনা-নাশক ওষুধ থেকে বঞ্চিত করেছে, আবার আর একদিকে যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতো তাদের একটু পরিমিত যৌন স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে তাদের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করেছে। একই রকম নিষ্ঠুরতায়, ইতালীয়দের শৃংখলা ও কর্তব্যের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বুক থেকে একটা ভার নেমে যায়, যখন দেখি যে, জার্মানদের ক্ষেত্রে এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার দিকে পশ্চাদ্‌গমন, কোনো প্রগতিশীল চিন্তা ছাড়াই, অতিক্রম করা গেছে। সে যাই হোক, ঘটনাপ্রবাহ এমন ধারায় এগিয়েছে যে, আজ রক্ষণশীল গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক প্রগতির অভিভাবক হয়ে উঠেছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্যাথলিক গির্জা প্রতিষ্ঠান

সংস্কৃতির বিপদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলেছে। যে ক্যাথলিক গির্জা এতকাল সমস্ত চিন্তার স্বাধীনতার শত্রু ছিল এবং সত্যকে স্বীকৃতি দেবার জন্য উন্নতি করার লক্ষ্যে পৃথিবী শাসিত হোক, এই রকম চিন্তাধারাকেও দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করত!

আমরা এখানে একটা ক্যাথলিক দেশে গির্জার সুরক্ষায় আছি, জানিনা, কতদিন এই সুরক্ষা থাকবে। যতদিন এই সুরক্ষা আছে, আমি স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু করবনা, যাতে গির্জার শত্রুতা জেগে ওঠে। এটা কাপুরুষতা নয়, এটা সাবধানতা; নতুন শত্রু– আর আমি এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকব, যেটা এই শত্রুর স্বার্থ সাধন করে– পুরোনো শত্রুর থেকে বেশি বিপজ্জনক, যার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করাটা আমরা আয়ত্ব করে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও মনোবিশ্লেষণের ওপর গবেষণার ব্যাপারটা ক্যাথলিসিজম্-এর কাছে সন্দেহজনক ব্যাপার। আমি বলব না যে এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের গবেষণার ফলাফল যদি ধর্মকে মানুষের একটা স্নায়বিক ব্যাধি-র পর্যায়ে নামিয়ে আনে এবং আমরা যেমন আমাদের কোনো রোগীর স্নায়বিক আবিষ্টতাকে লোকের কাছে ব্যাখ্যা করি তেমনিভাবে ধর্মের চমৎকার আবিষ্ট করার শক্তিকে ব্যাখ্যা করে, তাহলে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা এদেশের শাসক শক্তির বিরক্তি উৎপাদন করব। আমি নতুন কিছু বলতে চাইছি, তা নয়, অথবা ২৫ বছর আগে আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় যা বলেছি, তার বাইরে কিছু বলছি, তা নয়। এসব অবশ্য সবাই ভুলে গেছে এবং আমি যদি সে সব পুনরুল্লেখ করি এবং ধর্ম কীভাবে প্রবর্তিত হয়, তার কোনো বিশেষ উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করি, তাহলে নিঃসন্দেহে কিছু ফল তো হবেই। হয়ত আমাদের মনোবিশ্লেষণের কাজটাই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে এ ধরনের জবরদস্তি দমন প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়; যদি অন্য লোকে এই একই কাজ করে, সেটাকে তারা নিজেদের অধিকারে দখলদারিত্ব বলে মনে করে। যদিও মনোবিশ্লেষণ, আমার এই দীর্ঘ জীবনে যা সর্বত্র পৌঁছে গেছে, যে শহরে জন্মেছে ও বড় হয়েছে, তার চেয়ে ভালো কোনো আশ্রয় পায়নি।

আমি শুধু ভাবি, তাই নয়, আমি নিশ্চিত জানি যে, এই বাহ্যিক বিপদ মোজেসের ওপর লেখা আমার মতবাদের শেষ পর্বটি প্রকাশ করতে দেবে না। নিজেকে এই বলে আমি বাধাটা দূর করতে চেষ্টা করেছি যে, আমার ভয়টা নিজের ব্যক্তিগত গুরুত্বকে বাড়িয়ে ভাবার জন্য, এবং কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ, আমি মোজেস এবং একেশ্বরবাদী ধর্মের উৎস সম্বন্ধে কী বলি, না বলি, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবুও, আমার মনে হচ্ছে, আমার বিচার ঠিক নয়। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর চোখে আমার গুরুত্ব যাই হোক না কেন, বিদ্বেষ ও সাড়া জাগানোর ক্ষুধা এই জিনিসটা করাবে। কাজেই আমি এই রচনাটা প্রকাশ করব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি লিখব না। বেশি করে এই জন্য যে, এটা আগেও একবার লেখা হয়েছিল, দু'বছর আগে, আর তাই এখন দরকার শুধু আরেকবার লেখা আর আগের

দুটো রচনার সাথে যোগ করা। এইভাবে এইগুলোকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, যতদিন না একে নিরাপদে দিনের আলোয় আনা যায়, বা যতদিন না অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি একই মত পোষণ করেন বা একই উপসংহারে পৌঁছন, তাঁকে বলা যায়, "সেই অন্ধকার যুগেও একজন লোক ছিল, যে আপনার মতোই ভেবেছিল।"

২. জুন ১৯৩৮ (লন্ডন)

মোজেস্‌কে নিয়ে এই রচনাটি লিখবার সময় আমাকে যে প্রচণ্ড কঠিন পরিস্থিতির চাপ সহ্য করতে হয়েছিল– নিজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক বাধাগুলি– এই সব কারণে তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায়টির দুটি ভূমিকা লেখা হয়েছিল, পরস্পর বিরোধী তো বটেই– এমনকী একটা আর একটাকে বাতিল করে দিচ্ছে বলা যায়। কারণ এই দুটি ভূমিকা লেখার মধ্যবর্তী অল্প সময়ের মধ্যেই লেখকের বাহ্যিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল। আগে আমি ক্যাথলিক গির্জার সুরক্ষায় বাস করতাম এবং ভয় ছিল যে, রচনাটা প্রকাশ করলে আমি তো আমার সুরক্ষা হারাবোই, অষ্ট্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিকদের এবং ছাত্রদের কাজও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। তারপরই হঠাৎ, জার্মানী আমাদের আক্রমণ করল এবং জয় করল, আর ক্যাথলিসিজ্‌ম বাইবেলে বর্ণিত "অনির্ভরযোগ্য বস্তু" হয়ে গেল। নির্যাতন নিশ্চিত ছিল– শুধু আমার কাজের জন্যই নয়, আমার "জাতিত্বের" জন্যও– তাই আমি অনেক বন্ধুর সঙ্গে একত্রে দেশ পরিত্যাগ করলাম, সেই শহর, যেখানে আমার ছেলেবেলা থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত কেটেছে, যা এতদিন আমার নিজের দেশ ছিল।

সুন্দর, স্বাধীন, উদার ইংল্যান্ডে আমি পেলাম সাদর অভ্যর্থনা। এখন আমি এখানেই বাস করি, একজন সাদরে অভ্যর্থিত অতিথি, অত্যাচার থেকে মুক্ত, আবার বলতে পারব, লিখতে পারব ভেবে সুখী– বলতে যাচ্ছিলাম "ভাবতে পারব"– যা আমি চাই। এখন আমি সাহস করে আমার রচনার শেষ অংশটিকে সাধারণের গোচরে আনতে চাইছি।

এখন আর কোনো বাহ্যিক বাধা নেই, বা এমন কিছু নেই যা বিপদাশঙ্কা আনতে পারে। কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকার মধ্যেই আমি প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছি বন্ধুদের কাছ থেকে, যারা বলেছে আমাকে এখানে দেখে তারা কত খুশি এবং বেশ কিছু অপরিচিত লোকের কাছ থেকেও, যারা আমার কাজকর্মে আগ্রহী নয়, কেবলমাত্র আমি এখন এখানে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পেয়েছি, তাতেই তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এসব ছাড়াও আমি, একজন বিদেশির কাছে বিভ্রান্তিকর এত ঘন ঘন আর এক ধরনের চিঠি পেয়েছি, যাতে আমার আত্মার মঙ্গল কামনা করা হয়েছে এবং আমাকে খ্রিস্টের পথ দেখানো হয়েছে এবং ইস্‌রায়েল-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে আলোকদান করা হয়েছে। যে সব উত্তম ব্যক্তি আমাকে এই সব চিঠি

লিখেছিলেন, তাদের পক্ষে আমার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা সম্ভব ছিল না। অবশ্য আমি আশা করি, যখন আমার এই নতুন কাজ আমার নতুন স্বদেশবাসীদের গোচরে আসবে, তখন আমি এই চিঠিগুলির লেখকদের এবং বেশ কিছু অন্য ব্যক্তির সহানুভূতি হারাব, যা তারা এখন আমাকে দিয়ে চলেছে।

ভিন্ন রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র আর নতুন স্থায়ী নিবাস কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তন আনতে পারে না। তখনও যেমন, এখনও তেমনি, আমি আমার নিজের কাজের মুখোমুখি হলেই অস্বস্তি বোধ করি। একজন লেখক ও তার কাজের মধ্যে যে সচেতন একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত, আমি সেটাই খুঁজে পাই না। তার মানে এই নয় যে, আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস নেই। ২৫ বছর আগেই সেই বিশ্বাস আমি পেয়েছিলাম, যখন আমি আমার "টোটেম এবং টাবু" (১৯১২ সালে) বইটা লিখি এবং তার পর থেকে এই বিশ্বাস ক্রমাগত আরো দৃঢ় হয়েছে। তখন থেকে আমার কখনোই কোনো সংশয় ছিলনা যে, ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো কেবলমাত্র ব্যক্তিসত্ত্বার স্নায়বিক ব্যাধির নমুনা দিয়েই বুঝতে হবে, যেগুলো আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, মানব-পরিবারের আদিম ইতিহাসের দীর্ঘ-বিস্মৃত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি, যাদের চারিত্রিক আবেশ আচ্ছন্নতা তাদের সেই আদিম উৎসের কাছে ঋণী এবং কাজেই, এর মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে, তা থেকেই মানবজাতির ওপর এর প্রভাব পড়েছে। আমার অনিশ্চিয়তা শুরু হয় কেবল এই জায়গাতেই, যখন আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমি এখানে যে ইহুদি একেশ্বরবাদের উদাহরণ টেনে এনেছি, সেখানে আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি কিনা। ব্যক্তি মোজেসের ওপর এই যে বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করা আমার গবেষণা-প্রবন্ধ, এটা আমার দোষদর্শী চোখে একপায়ে ভর করে নাচা এক নর্তকীর মতো। নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করার এই পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যায় আমি যদি সমর্থন না পেতাম এবং সেখান থেকে মোজেসের 'পরিণতি' সম্পর্কে সেলিনের ব্যাখ্যায় চলে না যেতাম, তাহলে আমার এই পুরো প্রবন্ধটি কখনোই লেখা হতো না। যাই হোক্, এগোনো যাক।

মোজেসের ওপর লেখা আমার দ্বিতীয় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক রচনাটার ফলাফলের সারাংশ দিয়ে শুরু করি। এখানে আমি ওগুলো আর নিবিড় পরীক্ষা করব না, কারণ যে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা ওদের ভিত্তি করে করা হয়েছে, ওগুলোই আমার বিষয় আর বার বার ওদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

১ম পরিচ্ছেদ

১. ঐতিহাসিক সূত্রগুলি

যে ঘটনাপ্রবাহ আমাদের আগ্রহ জাগিয়েছে, তাদের ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌পট নিম্নরূপ: অষ্টাদশ রাজবংশের বিজয় অভিযানের পর ইজিপ্ট একটা বিশ্ব সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কিছু ধর্ম-সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার বিকাশের মধ্যে দিয়ে সমস্ত সাম্রাজ্যবাসীর মধ্যে না হলেও, শাসককুলের এবং রাজ্যের উচ্চ স্তরের সক্রিয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এই নতুন সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেছিল। ওন-এ সূর্যদেবতার (হেলিওপোলিস্) পুরোহিতদের প্রভাবে, সম্ভবত: এশিয়ার চিন্তাধারা থেকেও শক্তি আহরণ করে, একজন বিশ্বজনীন দেবতার, আটন-এর ধারণা তৈরি হয়েছিল, একজন ব্যক্তি বা একটি দেশের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। যুবক আমেন হোটেপ ৪ (যিনি পরে তার নাম পাল্‌টিয়ে ইখ্‌নাতন রেখেছিলেন) ফারাও হয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। এই রকম একজন দেবতার ধারণাকে পরিপূর্ণ বিকশিত করার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি আটন ধর্মকে সরকারী ধর্ম হিসাবে উন্নীত করেছিলেন এবং এভাবেই এই বিশ্বজনীন দেবতা 'একমাত্র ঈশ্বর' হয়ে উঠেছিলেন। অন্য দেবতাদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হত, সব হয়ে গেল প্রতারণা, ছলনা। ধর্মের মধ্যেকার জাদুবিদ্যা জাতীয় ধ্যান-ধারণার সমস্ত আকর্ষণ তিনি খুব ঠান্ডা মাথায় প্রতিহত করেন এবং বিশেষ করে ইজিপ্‌শিয়ানদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি বিভ্রম, মৃত্যুর পরের জীবন, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ওঁর আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ছিল; তিনি সূর্যের বিকীর্ণ রশ্মির তেজের মধ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের উদ্ভব, এটা বুঝতে পেরেছিলেন। এবং ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক হিসাবে সূর্যকে পূজা করতেন। সৃষ্টির এই আনন্দে এবং তাঁর মাত-এর (সত্য ও ন্যায়) মধ্যে জীবনযাপনে তিনি গৌরব বোধ করতেন।

মানুষের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম এবং হয়ত, সবচেয়ে খাঁটি, একেশ্বরবাদী ধর্ম। এই ধর্মের উৎসের ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অমূল্য বলে গণ্য হবে। যদিও আটন ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য যাতে আমরা না পাই, তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ইখ্‌নাতন-এর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, সব ভেঙে পড়েছিল। যে পুরোহিত কুলকে তিনি দমিয়ে রেখেছিলেন, তারা সুযোগ পেয়ে তাঁর স্মৃতির ওপরই তাদের ক্রোধের বিষোদ্গার করল। আটন-ধর্মের বিলোপ সাধন করা হল; বিরোধী মতাবলম্বী ফারাও-এর রাজধানী ধ্বংস করা হল, লুণ্ঠিত হল। ১৩৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে অষ্টাদশ রাজবংশ শেষ হয়ে গেল; কিছুকাল অরাজকতার পরে, সেনাপতি হারেম হাব, যিনি ১৩১৫ খ্রি. পূ. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন। ইখ্‌নাতন-এর সংস্কারগুলি কেবল একটি কাহিনী হয়ে থাকল, স্মৃতিতে পর্যবসিত হবার অপেক্ষায়।

এইটুকুই কেবল ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং আমাদের প্রকল্পের কাজ এখান থেকেই শুরু হচ্ছে। ইখ্‌নাতন-এর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে খুব সম্ভব, তুত্‌মিস বলে ডাকা হত, সেই সময়ে অনেকেরই ওই নাম ছিল; নামে কিছু যায় আসে না, কিন্তু নামটির দ্বিতীয় অংশটা নিশ্চয়ই "মোজ" ছিল। তিনি উচ্চপদাধিকারী ছিলেন এবং আটন ধর্মের একজন কট্টর অনুগামী ছিলেন, কিন্তু রাজা যেমন চিন্তাশীল ছিলেন, ইনি তেমনি অত্যন্ত তেজী এবং আবেগপ্রবণ ছিলেন। এই লোকের কাছে, ইখ্‌নাতন-এর মৃত্যু এবং তাঁর ধর্মের বিলুপ্তি, যেন সব আশার অবসান। তাঁকে ইজিপ্টে থাকতে হলে, হয় নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে, অথবা ধর্মমত পরিত্যাগ করে থাকতে হবে। যদি তিনি সেই সময় কোনো সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা থেকে থাকেন, তাহলে তিনি কোনো একটা সেমিটিক জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন যারা বেশ কয়েক পুরুষ আগে সেখানে চলে এসেছিল এবং বসবাস করছিল। নিজের হতাশা এবং একাকীত্বে-র চাপে তিনি শেষ পর্যন্ত হয়ত এই বিদেশী অপরিচিত জাতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাদের মধ্যেই তিনি তাঁর হারানো বিশ্বাসকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি এদেরই নিজের অনুগামী করে তোলেন এবং এদের মাধ্যমে নিজের আদর্শগুলিকে প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেন। এদের নিয়ে ইজিপ্ট ছেড়ে আসবার পর, সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুগামীরাও ছিল, তিনি এদের মধ্যে সুন্নৎ-এর প্রথা প্রবর্তন করে এদের পবিত্র করান, এদের জন্য আইন বিধি প্রণয়ন করেন এবং এদের আটন-ধর্মের সঙ্গে পরিচিত করেন, যে ধর্মকে ইজিপ্‌শিয়ানরা সবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। হয়ত, মোজেস তার ইহুদিদের ওপর যে আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা হয়ত, তাঁর গুরু এবং শিক্ষক ইখ্‌নাতন-এর আইনের চাইতেও বেশি কড়া ছিল; হয়ত তিনি সূর্যদেবতা ওন্‌-এর সঙ্গে যোগসূত্রটাও ছেঁটে ফেলেছিলেন।

ইজিপ্ট থেকে অভিনিষ্ক্রমণের জন্য, আমাদের দুই রাজশাসনের মধ্যবর্তী কালটাকে ১৩৫০ খ্রি. পূর্বাব্দের পরেই ধরতে হবে। ক্যানান দেশটিকে দখল করার আগে পর্যন্ত, তার পরের সময়টার ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এইখানে বাইবেলের রচনা যে অংশগুলি বাদ দিয়েছে, অথবা ইচ্ছা করেই অনুক্ত রেখেছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমাদের বর্তমান ঐতিহাসিক গবেষণায় দুটো সত্য বেরিয়ে এসেছে। প্রথমটি যেটি আর্নস্ট্ সেলিন আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি হল, ইহুদিরা, যারা, এমনকি বাইবেল অনুযায়ীও, একগুঁয়ে ও তাদের আইন প্রণেতা ও নেতার অবাধ্য ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল, তাদের নেতাকে মেরে ফেলেছি এবং যে আটন ধর্ম তাদের ওপর চাপানো হয়েছিল, তা পরিত্যাগ করেছিল, যেমনটি তাদের আগে ইজিপ্‌শিয়ান্‌রাও করেছিল। দ্বিতীয় সত্যটি, যেটি এডুয়ার্ড মেয়ের প্রমাণ করেছিলেন, সেটি হচ্ছে, এই ইহুদিরা ইজিপ্ট থেকে ফেরার পর প্যালেস্টাইন, সিনাই উপদ্বীপ এবং আরাবিয়ার সীমান্তের একটি প্রদেশে তাদের নিকট সম্পর্কিত একটি জাতির সঙ্গে মিলিত হয় এবং সেখানে, কাদেশ নামে একটা উর্বর অঞ্চলে, আরাবিয়ান মিডিয়ানাইট্‌দের প্রভাবে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, যেটা হল আগ্নেয়গিরির দেবতা যাহ্‌ভে-র পূজা। তারপরেই তারা ক্যানান দখল করার জন্য তৈরি হয়।

সময়ের মাপকাঠিতে এই দুই ঘটনার পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং অভিনিষ্ক্রমণের সঙ্গে সম্বন্ধ, দুটোই অত্যন্ত অনিশ্চিত। পরবর্তী ঐতিহাসিক উল্লেখ পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় ফারাও মের্নেপ্‌তা-র একটি প্রস্তর ফলকে, যিনি ১২১৫ খ্রি. পূ. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, যে ফলকে তাঁর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে বিজিত দেশগুলির মধ্যে "ইস্‌রায়েল"-এর উল্লেখ আছে। এই ফলকের তারিখটিকে যদি আমরা সময় সীমা নির্দেশক বলে ধরে নিই, তাহলে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটার জন্য, অভিনিষ্ক্রমণ থেকে শুরু করে, প্রায় এক শতাব্দী সময় পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ ১৩৫০ খ্রি. পূ. এর পর থেকে ১২১৫ খ্রি. পূ. পর্যন্ত। অবশ্য এটাও সম্ভব যে, এই ইস্‌রায়েল নামটা হয়ত সেই জাতিকে বোঝাচ্ছে না, যাদের ভাগ্য আমরা অনুসরণ করে চলেছি, এবং বাস্তবে হয়ত আমাদের হাতে আরো লম্বা সময় রয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ের ইহুদিদের ক্যানানে বসবাস শুরু করা নিশ্চয়ই একটা অতি শীঘ্র বিজয় সম্পন্ন করা ছিল না; সেটা ছিল একটার পর একটা লড়াই এবং নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল। আমরা যদি মের্নেপ্‌তা-র প্রস্তর ফলক প্রদত্ত সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থাকি, তাহলে হয়ত ৩০ বছর, একটি প্রজন্ম, মোজেসের সময় হিসাবে ভাবতে পারি এবং অন্ততঃ দুটো প্রজন্ম, হয়ত আরো কিছু বেশি, কাদেশে যে মিলন ঘটেছিল, সেটার সময় হিসাবে ভাবতে পারি; কাদেশ এবং ক্যানানের দিকে যাত্রা শুরু করার মধ্যবর্তী সময় বেশি লম্বা হওয়ার দরকার নেই। আমার শেষ রচনায় যেমন দেখিয়েছি– ইহুদি ঐতিহ্যের, অভিনিষ্ক্রমণ ও কাদেশে একটি ধর্ম প্রবর্তনের মধ্যের সময়কে ছোট করার সঙ্গত কারণ ছিল; আমাদের যুক্তি কিন্তু উল্টোটাই সমর্থন করবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গল্পের বহিরঙ্গ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, আমাদের ঐতিহাসিক কালের ফাঁকফোঁকরগুলো ভরবার চেষ্টা করছিলাম– অংশত: আমার দ্বিতীয় রচনাটার পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমাদের আগ্রহ রয়েছে মোজেস ও তাঁর মতবাদগুলির ওপর, ইহুদিদের বিদ্রোহ যা নষ্ট করে দিয়েছিল। যাহ্‌ভে-র কাহিনী প্রায় ১০০০ খ্রি. পূর্বাব্দে লেখা, যদিও নি:সন্দেহে তার অনেক আগের তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে, তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাতিগুলোর মিলন এবং কাদেশে একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা একটা আপস-মীমাংসার কথা বোঝায় যার দুটো অংশ এখনও সহজেই বোঝা যায়। একটা অংশ, দেবতা যাহ্‌ভে যে হালেই উদ্ভূত এবং বিদেশি, সেটা অস্বীকার করায় এবং লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রতি তাঁর দাবীকে বেশি জোরালো করে তোলায় ব্যস্ত। অন্য অংশ, তাদের ইজিপ্টের শাসন থেকে মুক্তি এবং তাদের মহান নেতা মোজেসের স্মৃতিকে, যা তাদের ভীষণ প্রিয়, পরিত্যাগ করতে পারবেনা; এবং সত্যিই তারা ইহুদিদের পূর্ব ইতিহাসের নতুন রচনায় এই সত্য ঘটনা এবং সেই মহান ব্যক্তির জন্য জায়গা বানাতে সক্ষম হয়েছিল। মোজেসের ধর্মের অন্তত: কিছু বাহ্যিক চিহ্ন ধরে রাখতে সফল হয়েছিল– যেমন সুন্নৎ-প্রথা এবং নতুন দেবতার নাম ব্যবহারে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার ওপর জোর দিয়েছিল। আমি বলেছি যে, যারা এই দাবীগুলো তুলেছিল, তারা ছিল মোজেসের অনুগামীদের বংশধর, লেভাইট্‌স, মোজেসের যারা প্রকৃত সমসাময়িক ও স্বদেশবাসী ছিল, তাদের থেকে মাত্র কয়েক পুরুষের ব্যবধান এবং তখনও তাজা একটি ঐতিহ্যের দ্বারা মোজেসের স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত। যাহ্‌ভে-অনুগামী এবং তাঁর পরের দিকের প্রতিযোগী এলোহিস্ট্‌দের ওপর লেখা বিশদ রচনাগুলো সমাধিফলকের মতো, যার নীচে সেই প্রাচীন কালের ঘটনাগুলোর সত্যতা, মোজেইক ধর্মের সত্য প্রকৃতি এবং সেই মহান ব্যক্তির নিষ্ঠুর হত্যা– যে সব সত্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল– সেগুলিকে চিরকালের মতো সমাধিস্থ করে রাখা উচিত। আর আমরা যদি ঘটনাপ্রবাহ সঠিক ভাবে বুঝে থাকি, তাহলে তাদের মধ্যে রহস্য কিছু নেই; ইহুদি জাতির ইতিহাসে হয়ত এটা মোজেস-উপাখ্যানের নিশ্চিত উপসংহার হত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এটা কিন্তু সেরকম হয়নি, সেই অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অনেক পরে বোঝা যাবে এবং অনেক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে। দেবতা যাহ্‌ভে প্রতিবেশী জাতিগুলির দেবতাদের চাইতে অন্যরকম ছিলেন, তা হওয়া সম্ভব ছিল না; তিনি অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, যেমন বিভিন্ন জাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, তবুও আমরা ধরে নিতে পারি যে, একজন সেই সময়কার যাহ্‌ভে-পূজারী ক্যানান, মোয়াব, আমালেক এইরকম সব দেশের দেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, যেমন এই সব দেশের দেবতাদের

ওপর যে সব জাতির বিশ্বাস ছিল, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করতে পারত না। একেশ্বরবাদী ধারণা, যেটা ইখ্‌নাতন-এর সময়ে জ্বলে উঠেছিল, আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দীর্ঘদিন অন্ধকারেই রয়ে গেল। এলিফ্যান্টাইন দ্বীপে, নীল নদের প্রথম জলপ্রপাতের কাছে অবাক-করে-দেওয়া আবিষ্কার হয়েছে, যে একটা ইহুদি সেনানিবাস, ওখানে কয়েক শতাব্দী আগে অবস্থিত ছিল, তারা তাদের মন্দিরে নিজেদের প্রধান দেবতা 'যাহু' ছাড়াও আরো দুজন দেবীর পূজা করত: একজন দেবীর নাম ছিল আনাত-যাহু। এটা সত্যি যে, এই ইহুদিরা তাদের মাতৃভূমি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মতো কোনো ধার্মিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি; পারস্য সরকার (খ্রি. পূ. ৫ম শতাব্দীতে) তাদের জেরুজালেমের নতুন আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনগুলো জানিয়েছিল। প্রাচীনকালে ফিরে গেলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, যাহ্‌ভে মোটেই মোজেইক ঈশ্বরের মতো ছিলেন না। আটন ছিলেন একজন শান্তিবাদী, পৃথিবীতে তাঁর সহকারীর মতো– অথবা বলা যায় তাঁর আদর্শ– ফারাও ইখ্‌নাতন, যিনি বুকের উপর দুহাত জড়ো করে, তাঁর পূর্বপুরুষদের জয় করা সাম্রাজ্যকে চোখের সামনে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যেতে দেখেছিলেন। যে জাতি নতুন নতুন দেশ যুদ্ধ জয় করার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তাদের জন্যে যাহ্‌ভে ছিলেন উপযোগী দেবতা। তাছাড়া, মোজেইক ঈশ্বরের মধ্যে যে জিনিসটা সম্মানযোগ্য ছিল, সেটা আদিম জাতির বোধগম্যতার বাইরে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি– এবং এই ব্যাপারে অন্যদের মতামতের সমর্থনও পেয়েছি– যে, ইহুদি ধর্মের বিকাশের কেন্দ্রীয় সত্য হচ্ছে এই : সময়ের সাথে সাথে যাহ্‌ভে নিজের প্রকৃতি হারালেন এবং মোজেসের ঈশ্বর আটন-এর মতো হয়ে উঠলেন। এটা সত্যি যে, কিছু তফাৎ তো রয়েই গেল, এবং প্রথমে দেখেই মনে হবে সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সেগুলো সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আটন ইজিপ্টের নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা সুখশান্তির সময়ে তাঁর রাজত্ব শুরু করেছিলেন এবং সেই সাম্রাজ্যের ভিত্ যখন নড়ে উঠেছিল, তখনও তাঁর ভক্তেরা পার্থিব বস্তুর থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে স্তুতি করছিল এবং উপভোগ করছিল। অদৃষ্ট ইহুদি জাতিকে একের পর এক সাংঘাতিক পরীক্ষা আর যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের ঈশ্বর হয়ে উঠছিলেন রূঢ়, কঠোর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি অবশ্য একজন বিশ্বজনীন ঈশ্বরের চরিত্র ধরে রেখেছিলেন, যিনি সকল দেশ ও জাতির ওপর প্রভুত্ব করেন; যদিও তাঁর পুজো যে ইজিপ্‌শিয়াদের হাত থেকে ইহুদিদের হাতে চলে যায়, এই সত্যটা একটা অতিরিক্ত মতবাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, যেটা হচ্ছে এই যে, ইহুদিরা তাঁর নিজের পছন্দ করা অনুগামী, যাদের এই বিশেষ আনুগত্য শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবে। একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে অন্যদের চেইতে তাদেরই পছন্দ করে বেছে নিয়েছেন, এই বিশ্বাসকে তাদের দুর্ভাগ্যের ভয়াবহ

অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল না। কিন্তু তারা সংশয়কে তাদের অভিভূত করতে দেয়নি, তারা নিজেদের অপরাধবোধকে বাড়িয়ে নিয়েছিল, যাতে তারা নিজেদের অবিশ্বাসকে চুপ করিয়ে রাখতে পারে এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তারা "ঈশ্বরের বুদ্ধির অগম্য ইচ্ছা"-র কাছে মাথা নত করত, যেমন ধার্মিক লোকেরা আজও করে থাকে। যদি এটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয় যে, তিনি নতুন নতুন অত্যাচারীদের– অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, পার্সিয়ান– তাঁর অনুগামীদের দমন করে অত্যাচার করতে দিয়েছিলেন– তবুও তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই সব দুষ্ট শত্রুদের বিনাশে এবং তাদের সাম্রাজ্যের পতনে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরবর্তীকালের ইহুদিদের ঈশ্বর, প্রাচীন মোজেইক ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। প্রথম এবং চূড়ান্ত বিষয়টি হল এই যে, তাঁকেই একমাত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হত, যার পাশে অন্য কোনও ঈশ্বরের কথা ভাবাও যেত না। একটা পুরো জাতি ইখ্‌নাতন-এর একেশ্বরবাদ-কে গভীরভাবে নিয়েছিল: প্রকৃতই এই জাতি এমনভাবে এই ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, এটাই তাদের বুদ্ধিজীবি জীবনের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ওদের অন্য বিষয়ে আগ্রহকে সরিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত জাতি এবং তাদের পুরোহিত সম্প্রদায়, যারা এই ধর্মবিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ ছিল, সকলেই এই একটি বিষয়ে একমত ছিল: কিন্তু এই পুরোহিত সম্প্রদায়, যারা এই ঈশ্বরের পুজোর জন্য আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করায় নিজেদের কর্মব্যস্ত রাখত, তারা দেখল যে, সমগ্র জাতি তাদের বিরোধিতা করছে এবং একটা জোরালো প্রবণতা এই জাতির মধ্যে এসে গেছে, যার দ্বারা তারা মোজেস-এর ঈশ্বরের ব্যাপারে আরো দুটো মতবাদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ধর্মপ্রবক্তার কণ্ঠ অক্লান্তভাবে ঘোষণা করেছিল যে, ঈশ্বর অনুষ্ঠান, উৎসর্গ ইত্যাদি অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং শুধু তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং একটি সত্য ও ন্যায়ের জীবন ছাড়া আর কিছুই চান না। যখন তারা মরুভূমিতে তাদের জীবনের সারল্য ও পবিত্রতাকে শ্রদ্ধা করত, তখন তারা নিশ্চয়ই মোজেসের আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল।

এখন একটি প্রশ্ন তুলবার সময় এসেছে। ইহুদিদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাকে চূড়ান্ত চেহারা দেবার জন্য মোজেস-এর প্রভাবকে টেনে আনার প্রয়োজন আছে কি? অনেক শতাব্দী ধরে একটা সাংস্কৃতিক জীবনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চ-মার্গীয় আধ্যাত্মিকতা-র বিকাশ ঘটবে, এটা ধরে নেওয়া কি যথেষ্ট নয়? এই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা যা আমাদের সমস্ত অনুমানকে শেষ করে দিতে পারে, তার ওপর আমার দুটো মন্তব্য আছে। প্রথম, এটা কোনো কিছু ব্যাখ্যাই করেনা। এই একই অবস্থায় গ্রিক জাতি তো একেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁকেনি, তারাই তো সবচেয়ে অগ্রসর ও জ্ঞানী জাতি ছিল, শুধু বহু-ঈশ্বরবাদ সরে গিয়ে দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল মাত্র। ইজিপ্টে একেশ্বরবাদ বেড়ে উঠেছিল– আমরা

বৃদ্ধি বলতে যা বুঝি– সেটা ছিল রাজতন্ত্রের একটা আনুষঙ্গিক প্রভাব; ঈশ্বর ছিলেন একটি বিশাল পার্থিব সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী ফারাও-এর প্রতিফলন মাত্র। ইহুদিদের ক্ষেত্রে, তাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, একজন একচেটিয়া জাতীয় ঈশ্বরের ধারণা থেকে একজন বিশ্বজনীন শাসনকর্তার ধারণার বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল। তাহলে কোথা থেকে এই ক্ষুদ্র, শক্তিহীন জাতি, একচ্ছত্র ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হিসাবে নিজেদের জাহির করার ঔদ্ধত্য পেল? ইহুদিদের মধ্যে একেশ্বরবাদ-এর উদ্ভবের প্রশ্নটি তাহলে অমীমাংসিতই থেকে যাবে, নাকি, বর্তমানে যে উত্তর আমরা পেয়েছি যে, ওদের একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিই এর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে? আমরা জানি যে, প্রতিভা ঠিক বোধগম্য নয় এবং অনির্ণেয় এবং সেইজন্যেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যান্য সমাধানের আশা শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ এই ব্যাপারটাকে বিবেচনায় না আনাই যুক্তিযুক্ত।

তাছাড়া, এটাও সত্যি যে, ইহুদিদের প্রামাণ্য নথিপত্র এবং ইতিহাস জোরগলায় বলে– একমাত্র ঈশ্বরের ধারণা মোজেসই জাতিকে দিয়েছিলেন, আর এ ব্যাপারে ওদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। এই বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যদি কোনো বিরোধিতা থাকে, তা হ'ল, পুরোহিতরা তাদের বাইবেলের পুনর্লিখনের সময় মোজেসের সম্বন্ধে বেশি, অতিরেশি গুণগান করেছিল, যেন মোজেসই সব কিছু করেছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী, এগুলি নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিকে পরিষ্কারভাবে মোজেসের আইন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, যাতে তাদের কর্তৃত্বের অধিকারকে আরও বাড়িয়ে তোলা যায়। এটাতেই সন্দেহের কারণ রয়েছে, কিন্তু আমরা একে ব্যবহার করতে পারব না। এই অতিরঞ্জিত করার পেছনে যে গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। পুরোহিতরা তাদের লিখিত বিবরণীর ভেতর দিয়ে তাদের সময় এবং মোজেসের কালের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইহুদি ধর্মে ইতিহাসের যা সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় বলে আমরা জেনেছি, সেটাকেই অস্বীকার করার চেষ্টা তারা করেছিল; যথা– মোজেসের আইন-প্রণয়ন এবং পরবর্তীকালের ইহুদি ধর্মের মাঝখানে একটি বিরাট সময়ের ব্যবধান ছিল– যে ফাঁকটা প্রথমে যাহ্‌ভে-র পূজা দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল এবং পরে ধীরে ধীরে ঢাকা দেওয়া হয়। ওদের উপস্থাপনা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ঘটনাক্রমকে অস্বীকার করে, যদিও এর ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহের অতীত, যেহেতু বাইবেলের বিষয়বস্তুর যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে, তার ভেতর এর প্রমাণ হিসাবে অনেক বক্তব্য আছে। যে প্রবণতা নতুন দেবতা যাহ্‌ভে-কে গোষ্ঠীপতিদের দেবতা বানিয়েছিল, পুরোহিতদের বক্তব্যও অনেকটা সেই লক্ষ্যে যেতে চেয়েছিল। পুরোহিত-তন্ত্রের নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে না যে, প্রকৃতপক্ষে মোজেস্-ই তাঁর ইহুদিদের একেশ্বরবাদের ধারণা দিয়েছিলেন। এই

মতকে সমর্থন করা সহজ হবে, কেননা আমরা বলতে পারি, মেজেসের কাছে এই ধারণাটা কোথা থেকে এসেছিল– যেটা ইহুদি পুরোহিত-সম্প্রদায় নিশ্চিতভাবে ভুলে গিয়েছিল।

এইখানে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, ইহুদি একেশ্বরবাদ যে ইজিপ্‌শিয়ানদের কাছ থেকে এসেছে, এটা প্রমাণ করে আমাদের কী লাভ। সমস্যাটা এভাবে এক পা পিছিয়ে দেওয়া যায়; আমরা একেশ্বরবাদের ধারণার সৃষ্টি সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানিনা। উত্তরটা হচ্ছে, এটা লাভের প্রশ্ন নয়, এটা গবেষণার প্রশ্ন। এবং আমরা হয়ত আসল পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করে কিছু জানতে পারব।

২. সুপ্তি সময়কাল এবং ঐতিহ্য

আমি বিশ্বাস করি যে, একমাত্র ঈশ্বরের ধারণা, এই ঈশ্বরের নামে সমস্ত নৈতিকতার দাবীর ওপর জোর দেওয়া এবং সবরকম জাদুটোনার অনুষ্ঠানগুলির পরিহার, এগুলি প্রকৃতপক্ষে মোজেসের মতবাদ, যা প্রথমদিকে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে আবার ফিরে এসেছিল এবং স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যে বিলম্বিত ফলাফল, একে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এই একই রকম ঘটনা আমরা আর কোথায় দেখতে পাই?

আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে, এই রকম ঘটনা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং সেগুলো নানারকম ভাবে প্রতিভাত হয়, যা সহজেই বোঝা যায়। উদাহরণ হিসাবে কোনো একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেওয়া যাক, যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদ। প্রথম দিকে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে একে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েক দশক ধরে এই তত্ত্ব নিয়ে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছিল; অবশ্য মাত্র এক পুরুষ পরেই এই বিবর্তনবাদকে সত্যের প্রতি এক মহান পদক্ষেপ বলে বুঝতে পারা গিয়েছিল। ডারউইনকেও ওয়েস্টমিনিষ্টার অ্যাবে-তে সমাধিস্থ করে সম্মান দেখান হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনাগুলোতে কোনো হেঁয়ালি নেই। নতুন সত্য আবেগাচ্ছন্ন বিরোধিতার সূত্রপাত করেছিল। আর এই অপ্রীতিকর নতুন মতবাদের সমর্থনে যে প্রমাণগুলি আছে, সেগুলির বিরোধিতা করার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করেই এই বিরোধিতা বেঁচে ছিল। দুটি বিভিন্ন মতবাদের এই লড়াই কিছু সময় পর্যন্ত চলেছিল। শুরু থেকেই, মতবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে লোকেরা ছিল, কিন্তু মতবাদের পক্ষে লোকেদের সংখ্যা এবং গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, তারাই সবল হয়ে উঠল। আর এই সারাটা লড়াই এর সময় কেউ ভোলেনি, কী বিষয় নিয়ে লড়াই চলছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল, এতে আমরা মোটেই আশ্চর্য হইনি; হয়ত আমরা সঠিকভাবে এই সত্যটা বুঝতে পারছিনা যে, এটা যা

হচ্ছিল, তা হচ্ছে একটা বিশাল জাতীয় মনস্তাত্ত্বিকতার বিকাশ এবং প্রসার। একজন ব্যক্তির মানসিক জীবনের সঙ্গে এই জিনিসটার পূর্ণাঙ্গ মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এই রকম ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি হয়ত নতুন কিছু শোনে, যেটা, কিছু প্রমাণ সাপেক্ষে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে বলা হয়; অথচ সেটা তার নিজের নানা ইচ্ছার প্রতিকূল এবং তার কিছু কিছু নিজের কাছে মূল্যবান ধ্যান-ধারণার মূলে আঘাত করে। সে তখন দ্বিধাগ্রস্ত হবে, এই নতুন সত্যকে সন্দেহের চোখে দেখার জন্য যুক্তিতর্ক প্রমাণ খুঁজে বেড়াবে এবং এভাবেই বেশ কিছুকাল তার একটা মানসিক দ্বন্দ্ব চলবে, যতক্ষণ না সে নিজের কাছেই স্বীকার করে নেয়, "মনে হয় এটাই সত্য, যদিও এটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে খুব কঠিন লাগছে আর এতে বিশ্বাস করাটাও যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে।" এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা যা শিখলাম তা হচ্ছে এই যে, মনের ভেতরকার গেড়ে বসে থাকা শক্তিশালী অনুভবগুলির যে বিরোধিতা, তাকে অহংবোধের বুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা জয় করতে সময় লাগে। আমরা যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, এটা অবশ্য তার খুব একটা অনুরূপ নয়।

পরবর্তী যে উদাহরণটা আমরা নেব, সেটার বোধ হয় আমাদের সমস্যার সাথে আরো কম সাদৃশ্য আছে। এমনও হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি, একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা, যেমন একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা-র জায়গা থেকে দৃশ্যতঃ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে। পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে তার গুরুতর মানসিক এবং অন্যান্য স্নায়ুঘটিত লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেটা দুর্ঘটনার সময় সে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিল বা দুর্ঘটনার সময় আরো অন্য কিছু ঘটে থাকতে পারে, তার প্রভাবে ঘটতে পারে। তার যেটা হল, সেটা হচ্ছে, "ট্রম্যাটিক নিউরোসিস," আঘাত জনিত স্নায়বিক ব্যাধি। এটা একদম বোধগম্যতার বাইরে এবং তাই এটা একটা অভিনব সত্য। দুর্ঘটনার এবং মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলো প্রকাশের মাঝখানে যে সময়ের ব্যবধান, তাকে বলা হয় "ইনকিউবেশান পিরিয়ড," সুপ্তি সময়কাল, সংক্রামক রোগের প্যাথলজির সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট মিল খোঁজা। পরে আরো ভাবনা-চিন্তা করার পর আমরা দেখি যে– এই দুটো বিষয়ের মধ্যে মূলগত তফাৎ থাকলে, ট্রম্যাটিক নিউরোসিস এবং ইহুদি একেশ্বরবাদ-এর সমস্যা দুটির মধ্যে একটি ব্যাপারে যোগসূত্র আছে। এটা হচ্ছে সেই বিষয় যাকে সুপ্তির কাল বলা যেতে পারে। এটা ভাববার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে মোজেসের ধর্ম থেকে সরে আসার পর থেকে একটা দীর্ঘ সময় ছিল, যখন একেশ্বরবাদের ধারণার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেত না। আচার-অনুষ্ঠানকে নিন্দনীয় বলে বাতিল করা এবং নৈতিকতার ওপরে জোর দেওয়ার কোনো ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যেতনা। কাজেই আমাদের একটা সম্ভাবনার জন্যে তৈরি থাকতে হবে যে, আমাদের সমস্যার সমাধান একটা বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে খুঁজতে হবে।

আমি একাধিকবার কাদেশের ঘটনাবলীকে পর্যবেক্ষণ করেছি, যখন পরবর্তীকালের ইহুদি জাতির দুটো অংশ মিলিত হয়ে নতুন ধর্মটিকে গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে যারা ইজিপ্টে ছিল, তাদের অভিনিক্রমণ ও মোজেস-এর স্মৃতি এত প্রখর ও স্পস্ট ছিল যে, তাদের যে কোনো গোড়ার দিকের ইতিহাসে এগুলো ঢোকানোর জন্য তারা অত্যন্ত তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে হয়ত এমন লোকেরাও ছিল, যারা, মোজেসকে ব্যক্তিগতভাবে জানত এমন লোকেদের নাতিপুতি, এবং তারা হয়ত নিজেদের তখনও ইজিপ্শিয়ান ভাবত এবং তাদের নামগুলোও ইজিপ্শিয়ান নাম ছিল। তাদের নেতা এবং আইন-প্রণয়নকারীর ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তার স্মৃতিকে "দমিয়ে রাখা"-র জন্যে তাদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই মিলিত জাতিটার অন্য অংশটির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেবতাকে মহিমান্বিত করে তোলা এবং তাঁর বিদেশিত্ব-কে অস্বীকার করা। আগে যে একটা ধর্ম ছিল এবং বিশেষ করে, সেই ধর্মের কী কী বক্তব্য ছিল, সেটা দুই পক্ষই কিন্তু অস্বীকার করার জন্যে সমানভাবে ব্যগ্র ছিল। এই ভাবেই প্রথম আপস-মীমাংসা হয়েছিল, যেটা খুব সম্ভব লিখিত সংকেত-বদ্ধ করা হয়েছিল; ইজিপ্ট থেকে আগত লোকেরা সঙ্গে করে লিখন-পদ্ধতি নিয়ে এসেছিল এবং তারা ইতিহাস লিখে রাখতে পছন্দ করত। অবশ্য যতদিনে ঐতিহাসিকরা বাস্তব সত্যের একটা আদর্শ রূপ বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ততদিনে একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রথমদিকে তারা নিজেদের প্রয়োজনে এবং তৎকালীন প্রবণতার দিকে নজর রেখে তাদের লিখিত বিষয়বস্তুকে রূপ দিতেন। তাদের বিবেক ছিল পরিষ্কার, যেন তারা বুঝতেন না মিথ্যা কী জিনিস বোঝায়। তার ফলে, একই বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত বয়ান ও মৌখিক বয়ানের মধ্যে তফাৎ দেখা দিতে লাগল। এই মৌখিক বয়ানই হয়ে দাঁড়াল ঐতিহ্য। লিখিত বয়ানে যে বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে অথবা পরিবর্তন করা হয়েছে, সেগুলো হয়ত ঐতিহ্যের মধ্যে অক্ষত, অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষিত হত। ঐতিহ্য ছিল লিখিত রচনার পরিপূরক, আবার কখনও বা লিখিত ইতিহাসের বিপরীত। ঐতিহ্য বিকৃত করার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল– কাজেই লিখিত বর্ণনার চাইতে বেশি সত্যতা তার মধ্যে ছিল। এর বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্য খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হত, কারণ এগুলো খানিকটা অস্পষ্ট ছিল এবং লিখিত বর্ণনার চাইতে খানিকটা অনিশ্চয়তা এর মধ্যে থাকত, কারণ এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে মুখে মুখে বর্ণিত হত বলে, নানারকম বিকৃতি, পরিবর্তন, এ সবের প্রচুর সম্ভাবনা থাকত। এই ধরণের ঐতিহ্যের ভিন্ন ফল হতে পারে। ভিন্ন যে সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি, তা হ'ল লিখিত বিবরণী এই ঐতিহ্যকে গ্রাস করে নেবে, সরিয়ে দেবে, এবং এই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন হতে হতে লুপ্ত হয়ে যাবে, লোকে ভুলে যাবে। আরেকটাও হতে পারে, এই ঐতিহ্যই একটা লিখিত বিবরণীতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আরো নানা সম্ভাবনা আছে, যা পরে উল্লেখ করা হবে।

ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে সুপ্তিকালের বিষয়টির ব্যাখ্যা এর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে : তথাকথিত সরকারি লিখিত ইতিহাসে যে সব ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেগুলো আসলে কখনোই হারিয়ে যায়নি। সেই সব ঘটনার কথা ঐতিহ্যের মধ্যে বেঁচে ছিল এবং লোকেদের মুখে মুখে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। আর্নস্ট্ সেলিনের মতে, মোজেস-এর মৃত্যুর ব্যাপারেও একটা ঐতিহ্য ছিল, যেটা সরাসরি সরকারি বয়ানের বিরোধী ছিল এবং সত্যের খুব কাছাকাছি ছিল। আমরা ধরে নিতে পারি যে, মোজেসের মৃত্যুর সাথে সাথে অন্য যে সমস্ত বিশ্বাস, মোজেইক ধর্মের মতবাদ ও সিদ্ধান্তগুলো যেগুলো মোজেসের সমসাময়িকদের অধিকাংশের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, তাদের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

এইখানে আমরা একটা উল্লেখযোগ্য সত্যের মুখোমুখি হই। সেটা হচ্ছে এই যে, এই ঐতিহ্যগুলি সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হওয়ার বদলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে পরবর্তীকালের সরকারি বিবরণীর ভেতর জায়গা করে নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতির ভাবনা ও সক্রিয়তার ওপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করার মতো শক্তির প্রমাণ রেখেছিল। কী ছিল সেই অবস্থা যাতে এই বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তা কিন্তু মোটেই পরিষ্কার নয়।

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত, এমন যে এটাকে আবার নতুন করে পরীক্ষা করার যৌক্তিকতা আছে। আর এর ভেতরেই আছে আমাদের সমস্যাটা। ইহুদি জাতি, মোজেস তাদের যে আটন ধর্ম দিয়েছিলেন, তা পরিত্যাগ করেছিল এবং অন্য আর এক দেবতার পুজো শুরু করেছিল, যে দেবতার, তাদের প্রতিবেশী জাতির দেবতা বালিম-এর সঙ্গে বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না। পরবর্তীকালের যাবতীয় বিকৃতকারী প্রভাবও এই অপমানকর সত্যকে ঢেকে রাখতে পারেনি। তবুও মোজেসের ধর্ম কোনো চিহ্ন না রেখে লুপ্ত হয়ে যায়নি; তার একধরণের স্মৃতি বেঁচে ছিল, একটা ঐতিহ্য, হয়ত অস্পষ্ট ও বিকৃত, তবু তা বেঁচে ছিল। একটা মহান অতীতের এই ঐতিহ্য কিন্তু পশ্চাৎপটে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, যতদিন না সেটা জনমানসে বেশি, আরো বেশি, জোরালো হয়ে ফুটে উঠছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেবতা যাহ্ভেকে মোজেইক ঈশ্বরে পরিবর্তিত করতে সফল হয়েছিল, এবং কয়েক শতাব্দী আগে মোজেস যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন এবং যা পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছিল, তাতে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেও সফল হয়েছিল। একটা সুপ্ত ঐতিহ্য যে কোনো জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এত জোরালো প্রভাব ফেলতে পারে, এটা কিন্তু আমাদের পরিচিত কোনো ধারণা নয়। এখানে আমরা একটা জন-মানসিকতার রাজ্যে এসে পড়েছি, যেটা আমাদের পরিচিত নয়। আমাদের এখন সাদৃশ্য খুঁজতে হবে, অনুরূপ কোনো ঘটনা, অন্য বিষয়ের হলেও, খুঁজে বের করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, সে সব আমরা খুঁজে পাবোই।

যখন মোজেসের ধর্ম ফিরে আসার সময়টা ঘনিয়ে আসছিল, সেই সময় গ্রিক জাতির কাছে নায়কদের সম্বন্ধে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী এবং অন্যান্য গল্প-গাথার বিশাল ভান্ডার মজুত ছিল। মনে করা হয় যে, নবম বা অষ্টম খ্রি. পূর্বাব্দে যে হোমারের মহাকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছিল, তার মাল-মশলা সেই সব পৌরাণিক কাহিনী থেকেই আহরণ করা। আমাদের বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে আমরা শ্লীম্যান এবং ইভান্স-এর অনেক আগেই প্রশ্ন করতে পারতাম: গ্রিকেরা এই সব গল্প-গাথা ও পৌরাণিক কাহিনীর মালমশলা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল, যা হোমার এবং অন্য বড় বড় অ্যাট্টিক নাট্যকাররা অমর শিল্পকলায় রূপান্তরিত করেছিলেন? উত্তরটা এই হবে: এই জাতি তাদের প্রাচীন ইতিহাসকালে হয়ত একটা বাহ্যিক জাঁকজমক ও অত্যন্ত উচ্চমানের সংস্কৃতির একটা পর্বের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়– ইতিহাস অন্তত সেই কথাই বলে– এবং যার একটা ক্ষীণ রেশ এই সব পৌরাণিক কাহিনী ও গল্প গাথার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। আমাদের বর্তমান সময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় এবং এই সমর্থন যদি আরো আগে পাওয়া যেত, তাহলে সেটাকে একটা দু:সাহস বলে বিবেচনা করা হত। এই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় চমৎকার মিনোয়ান-মাইসিনিয়ান সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা সম্ভবত: গ্রিক ভূখণ্ডে ১২৫০ খ্রি. পূর্বাব্দেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের গ্রিক ঐতিহাসিকরা এর কথা উল্লেখই করে না। একটা কথা বলা হয় যে, এক সময়ে ক্রেটান্-রা সমুদ্র শাসন করত, রাজা মিনোস্-এর নাম এবং তার রাজপ্রাসাদের এবং তার জটিল গোলকধাঁধার কথাও উল্লেখ করা হত; কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেই মহান কালের কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু সেই ক্ষীণ ঐতিহ্যের ধারাটি রয়ে গেছে, যা সেই মহান লেখকেরা হস্তগত করেছিলেন।

অন্যান্য জাতিরও একই রকম লোকগাথা, মহান লোক-কাব্য ইত্যাদি আছে– যেমন, ভারতীয়দের, ফিনদের, এবং জার্মানদের। সাহিত্য-ইতিহাসবিদ্‌রা তদন্ত করে বলতে পারবেন, গ্রিক্‌দের যে দশা হয়েছিল, এদেরও সেই একই পরিস্থিতি হয়েছিল কিনা। আমার মনে হয়, এই রকম একটা তদন্তের একটা যথার্থ ফল পাওয়া যাবে। লোক-মহাকাব্যের উৎস সন্ধানে যে সব শর্ত আমরা নির্দিষ্ট করেছি, তা নিম্নরূপ: প্রাচীন ইতিহাসের একটা সময়কাল ছিল, যার ঠিক পরে পরেই সেই সময়কালটিকে ঘটনাবহুল, উল্লেখনীয়, চমৎকার এবং হয়ত সবসময়েই বীরোচিত বলে ভাবা হত; কিন্তু এসব এত আগে এবং এত সুদূর অতীতে ঘটেছিল যে, পরবর্তী প্রজন্মরা এ সবের কোনো খবরই রাখত না, শুধু একটা অস্পষ্ট, ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ ঐতিহ্যের সামান্য রেশ ছাড়া। পরবর্তী যুগে মহাকাব্যের সাহিত্যরূপটাও যে একেবারে হারিয়ে যাবে, এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, মহাকাব্য লেখার মতো পরিস্থিতি তখন আর ছিল না। পুরোনো মাল-মশলা ব্যবহৃত হয়ে গেছে এবং পরবর্তী

ঘটনাগুলোর ব্যাপারে ইতিহাস ঐতিহ্যের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। আমাদের বর্তমান সময়কার অসমসাহসী কীর্তিকলাপগুলোও কোনো মহাকাব্যের প্রেরণা জোগাতে সমর্থ হয়না; আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নিজেও অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর জীবনের ঘটনাবলী লিখে রাখার জন্য কোনো হোমার-এর আবির্ভাব হয়নি।

কল্পনার জাল বুনবার জন্যে অতীতকালের দারুণ আকর্ষণ আছে, কখনও কখনও বেশ রহস্য-ঘেরা অতীত হলে, আরো ভালো। মানুষ নিজের বর্তমান নিয়ে অসুখী হলে– যা প্রায়শই হয়– অতীতে ফিরে যায় এবং অতীত থেকেই একটা অবিস্মরণীয় সোনালি যুগের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার বিশ্বাস অর্জন করার আশা করে। বোধ হয় মানুষ এখনও তার বাল্যকালের স্মৃতির জাদুর ছোঁয়ায় বেঁচে থাকে এবং তার স্মৃতিতে তার বাল্যকাল একটা নিখাদ স্বর্গসুখের কাল বলে মনে হয়। অসম্পূর্ণ এবং ক্ষীণ অতীতের স্মৃতি, যাকে আমরা ঐতিহ্য বলছি, এগুলো শিল্পীদের কাছে দারুণ উৎসাহদায়ক প্রাপ্তি, কারণ তাঁরা তখন স্বাধীনভাবে সেই স্মৃতির ফাঁকফোকরগুলো নিজের কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি করতে পারেন এবং যে সময়কার কথা উনি লিখতে চান, তাকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সেই রকম রূপ দিতে পারেন। এভাবেও বলা যায় যে, ঐতিহ্য যতই ছায়াচ্ছন্ন, অস্পষ্ট হবে, সেটা কবিদের কাছে ততই বেশি ব্যবহারের উপযুক্ত মনে হবে। কাজেই কাব্যের জন্য ঐতিহ্যের যে মূল্য, তাতে আমাদের অবাক হবার কিছু নেই। আর কিছু নির্দিষ্ট শর্তের ওপর লোককাব্যের নির্ভরশীলতার যে সাদৃশ্য আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের এই অদ্ভুত ধারণাটা মানতে বাধ্য করবে যে, ইহুদিদের ক্ষেত্রে মোজেস-এর ঐতিহ্যটাই যাহ্‌ভে-পূজাকে পুরাতন মোজেইক ধর্মের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই দুটো বিষয় অবশ্য অন্যান্য দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে পরিণতি হচ্ছে কাব্য, অন্যটিতে ধর্ম, আর আমরা ধরে নিয়েছি যে, পরেরটা– একটা ঐতিহ্যের শক্তিতে– বিশ্বস্ততার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার জন্যে অবশ্যই, মহাকাব্য কোনো তুলনা আনতে পারে না। অতএব, আমাদের সমস্যাকে আরো ভালো সাদৃশ্য খুঁজতে হবে।

৩. সাদৃশ্য

ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে আমরা যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, তার একমাত্র সত্যিকারের সন্তোষজনক সাদৃশ্য, আমাদের সমস্যা থেকে বহুদূরের অন্য একটি ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এটি খুবই সম্পূর্ণ, প্রায় অভিন্ন বলা যায়। এখানেও আবার আমরা সেই সুপ্তির কাল দেখতে পাই, একটা ব্যাখ্যার অতীত প্রকাশ, যার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং একটি প্রাচীন ও পরবর্তীকালে বিস্মৃত অভিজ্ঞতার কঠিন শর্ত। এখানেও আমরা একটা জোর জবরদস্তি করার

বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, যেটা– যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে– মনোগত জীবনকে অঙ্গীভূত করে; এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যার সঙ্গে মহাকাব্যের সূচনার কোনো সম্পর্ক নেই।

এই সাদৃশ্য দেখা যায় মানসিক অস্থিরতার মধ্যে, মানুষের স্নায়বিক পীড়ার সূচনার মধ্যে; তার মানে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের অধীন একটি শাখায়, যেখানে ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে অবশ্যই জনমনস্তত্ত্বের একটা অংশ বলে ধরতে হবে। আমরা দেখব যে, এই সাদৃশ্য, প্রথমে যেমন মনে হচ্ছে, তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়; প্রকৃতপক্ষে এটা একটা স্বত:সিদ্ধ প্রকৃতির জিনিস।

শিশুকালে আমাদের ওপর যে সব প্রভাব পড়ে এবং যেগুলো পরবর্তীকালে ভুলে যাই, স্নায়বিক পীড়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য যার ওপর আমি এত গুরুত্ব দিয়েছিলাম, তাকে মানসিক আঘাত বলা হয়। স্নায়বিক পীড়ার এই নিদানতত্ত্বকে সাধারণভাবে আঘাতজনিত বলে ভাবা যায় কিনা, এটা একটা খোলা প্রশ্ন হতেই পারে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আপত্তি হচ্ছে এই যে, কোনো স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সূচনার ইতিহাসে কোনো মানসিক আঘাত সর্বদাই স্পষ্ট বোঝা যায় না। প্রায়শ:ই আমাদের এই বলে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেই এটা অন্য কিছু নয়, শুধু জীবনের অভিজ্ঞতা ও চাহিদার প্রতি একটি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; অনেক লোকই কিন্তু এ সব ব্যাপার অন্যরকমভাবে করে থাকে, যেটাকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ বলতে পারি। যেখানে আমরা বংশগত এবং ধাতগত স্বভাব ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনা, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বলতে ইচ্ছা হয় যে, ওই স্নায়বিক ব্যাধি হঠাৎ করে হয়নি, ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমটি হল, স্নায়বিক ব্যাধির সূচনা সর্বদাই শিশুকালের গোড়ার দিকের প্রভাবগুলির দিকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি হল, এটা বলাটা সঠিক হবে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা "মানসিক আঘাতজনিত" বলে নির্দিষ্ট করে দিই, কারণ তার ফলাফল কিন্তু সেই গোড়ার দিকের এক বা একাধিক জোরালো প্রভাবের দিকে অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করে। সেগুলোকে স্বাভাবিকভাবে অপসারিত করা যায়না, কাজেই একথা বলা যায় যে, যদি এটা বা সেটা না ঘটত, তাহলে কোনো স্নায়বিক পীড়াই ঘটত না। আমরা এই মানসিক আঘাতের মামলাগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজার এই ব্যাপারটা যদি সীমাবদ্ধ রাখি, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবুও, এই দু'জাতীয় ব্যাপার দুটোর মধ্যে যে ফারাক্ তা কিন্তু সেতুবন্ধন করা যাবে না, তা নয়। দুজাতীয় নিদানতত্ত্বকে একটা ধারণার মধ্যে সংযুক্ত করাটা সম্ভব; শুধু 'মানসিক আঘাত জনিত' এই সংজ্ঞাটা কাকে দেওয়া হচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করবে। যদি আমরা ধরে নিই যে, একটা অভিজ্ঞতা, মানসিক আঘাত-প্রাপ্ত চরিত্র অর্জন করে কেবলমাত্র পরিমাত্রিক গুণের ফলস্বরূপ– অর্থাৎ যদি সেই অভিজ্ঞতা

অস্বাভাবিক বিকারতত্ত্বীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহলে সেই ব্যক্তিত্বের ওপর অতিরিক্ত দাবী করাটাই ভুল হয়েছে বলে ধরতে হবে– তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোনো জিনিস এক ধরণের মানসিক বিন্যাসে মানসিক আঘাত সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু অন্য ধরণের মানসিক গঠনের ওপর তার কোনো প্রভাব খাটেনা। তারপরই আমাদের একটা সহচারী মানের ধারণা তৈরি হয়, তথাকথিত একটা পরিপূরক শৃংখল, যেখানে দুটো উপাদান মিলিত হয়ে নিদানতত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ করে; একটি উপাদানের ঋণাত্মক চরিত্র অন্য উপাদানটির ধনাত্মক চরিত্রের ক্ষতিপূরণ করে। সাধারণতঃ দুটি উপাদানই একসঙ্গে কাজ করে এবং কেবল এই শৃংখলের যে কোনো প্রান্তে আমরা একটি সরল প্রেষণার কথা বলতে পারি। এই যুক্তিতে আমরা মানসিক আঘাত-জনিত ও মানসিক আঘাতজনিত নয়, এমন নিদানতত্ত্বের মধ্যে যে তফাৎ আছে, তাকে আমাদের সাদৃশ্য খোঁজার ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় বলে, বাদ দিতে পারি। এই গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য খোঁজার ব্যাপারে যে সব তথ্য পাওয়া গেল, সেগুলোকে এবার একসঙ্গে করাটা কার্যকর হবে, যদিও কিছু পুনরুক্তি থাকবেই। সেগুলো হল নিম্নরূপঃ আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যাকে আমরা স্নায়ুপীড়ার লক্ষণ বলি, সেগুলো সব, কিছু অভিজ্ঞতা, আর কিছু প্রভাব, যেগুলোকে আমরা নিদানতত্ত্বের মানসিক আঘাত বলে জানি। আমরা এখন জানতে চাই, মোটামুটি একটা পরিকল্পিত উপায়ে, এই সব অভিজ্ঞতা এবং স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণগুলোর সাধারণ বিশেষত্বগুলো কী।

প্রথমে আমরা আগেরটা দিয়ে শুরু করি। এই সব মানসিক আঘাত বাল্যকালেই হয়ে থাকে, প্রায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। বাচ্চা যখন থেকে কথা বলতে আরম্ভ করে, সেই সময়কার প্রভাবগুলোই বিশেষ করে আকর্ষণীয়। দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর কখন থেকে এই মানসিক আঘাতের প্রতি স্পর্শকাতরতা শুরু হয় তা কিন্তু আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি না।

সেই সব অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পূর্ণ ভুলে যায় এবং স্মৃতিতে থাকে না। ওগুলো শৈশবকালীন স্মৃতি-ভ্রংশ সময়ের মধ্যে হয়, যেটা আবার প্রায়ই পৃথক পৃথক ভাঙা ভাঙা স্মৃতির টুকরো হয়ে উৎপাত করে, যেটাকে "স্ক্রিন মেমরি" বলা হয়।

সেগুলো আবার ইন্দ্রিয়গত এবং আক্রমণাত্মক স্বভাবের প্রভাবগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রথমদিকের কিছু নিজের ওপর আঘাতও (আত্মরতি-র প্রতি আঘাত)। এখানে বলতে হবে যে, সেই অল্পবয়সের বাচ্চারা ইন্দ্রিয়গত এবং সম্পূর্ণ আক্রমণজনিত ক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনো তফাত করতে পারে না, যেমন পরে পরবর্তীকালে বয়স হলে (যৌনক্রিয়ার "বিকৃতকামী" ভুল বোঝা এই প্রসঙ্গের মধ্যে আসে)। এটা অবশ্য খুবই লক্ষণীয় যে, যৌন ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় এবং আমাদের মতবাদের মধ্যে এই ব্যাপারটাকে বিবেচনা করতে হবে।

এই তিনটি বিষয়– জীবনের প্রথম পাঁচবছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো, সেগুলো ভুলে যাওয়া, এবং ইন্দ্রিয়গত ও আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্য– খুব কাছাকাছিই থাকে। আঘাতগুলো হয় শারিরীক অভিজ্ঞতা, অথবা উপলব্ধি, বিশেষ করে যেগুলো শোনা বা দেখা; অর্থাৎ সেগুলো হয় অভিজ্ঞতা, অথবা মানসিক ছাপ। এই তিনটি বিষয়কে কোন্ জিনিস যুক্ত করে, সেটা বিশ্লেষণ করে তত্ত্বীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; একমাত্র এটাই ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারে, অথবা– আরো বাস্তবভাবে বলতে গেলে, যদিও সেটা বেশি বেঠিক হবে– সেই বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলোকে স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তত্ত্ব একথা বলে যে, প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী, মানুষের যৌনজীবন– অথবা পরবর্তীকালে এব্যাপারে যা বোঝায়– খুব শিশুকালেই প্রস্ফুটিত হয় এবং প্রায় পাঁচ বছর বয়সেই সেটা শেষ হয়ে যায়। তারপরেই আসে তথাকথিত সুপ্তির কাল, একেবারে বয়:সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত সেটা থাকে– যে সময়ে আর কোনো যৌন বিকাশ ঘটে না; উল্টোদিকে, যা কিছু অর্জিত হয়েছিল, সে সব প্রতীপ গতিতে পেছনে চলে যায়। এই তত্ত্ব কিন্তু অঙ্গব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়-র বৃদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণাতে প্রমানিত; এতে বলা হচ্ছে যে, মানুষের এমন এক শ্রেণীর পশু থেকে উদ্ভব হয়েছে যারা পাঁচবছর বয়সেই যৌনজীবনে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হত, এবং এই সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, এই যে বন্ধ হয়ে যাওয়া, তারপর আবার নতুন করে শুরু হওয়া যৌন জীবন, এটার সঙ্গে পশু থেকে মানুষে বিবর্তনের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যার জীবনে এই সুপ্তির কাল এবং বিলম্বিত যৌনকামনা আছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ওপর অনুসন্ধান চালালে, আমি যতদূর জানি, এখনও তা করা হয়নি, এই তত্ত্বের উপর একটা অমূল্য পরীক্ষা চালানো যেত। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা নিশ্চয়ই উল্লেখনীয় যে, শৈশবের স্মৃতিভ্রংশের সময়কাল এই শৈশবের যৌনতা প্রস্ফুটিত হবার সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। হয়ত এটাই স্নায়বিক পীড়ার অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্ত, যেটা কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে এবং এই আলোতে বিচার করলে এটাকে মনে হয় আদিম জীবনের থেকে উত্তরণ– যেমন কিছু কিছু আমাদের শারিরীক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলাতেও ঘটে।

সব রকম স্নায়বিক পীড়ার ক্ষেত্রে কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ? এখানে আমরা দুটো বিষয় ভাবতে পারি। মানসিক আঘাতের ফল হচ্ছে দু' জাতীয়, অস্তিমূলক এবং নাস্তিমূলক। প্রথমটি হচ্ছে সেই মানসিক আঘাতকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা, বিস্মৃত অভিজ্ঞতাকে স্মরণে আনবার প্রচেষ্টা, অথবা আরো ভালো, সেটাকে একেবারে সত্যিকারের করে তোলার চেষ্টা, সেই ঘটনাটার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আরেকবার যাওয়া; যদি সেটা একটা প্রথমদিককার আবেগ-ঘটিত কোনো সম্পর্ক হয়ে থাকে, সেটাকে তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অনুরূপ যোগসূত্র স্থাপন করে বাঁচিয়ে তোলা যায়। এই প্রচেষ্টাগুলিকে এক কথায় বলা হয়, "মানসিক আঘাতের প্রতি আসক্তি" এবং "পুনরাবৃত্তি-বাধ্যতামূলক," এর ফল যা হয় তা তথাকথিত

স্বাভাবিক অহং-এর মধ্যে নিয়ে আসা যায় এবং স্থির প্রবণতার চেহারায় একে একটা অপরিবর্তনীয় চারিত্রিক বিশেষত্ব দেওয়া যায়, যদিও– অথবা সেই কারণে– এদের আসল কারণ– এদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি, ইত্যাদি ভুলে যায়। কাজেই, একজন লোক, যে কিনা তার বাল্যকাল অতিরিক্ত এবং পরে বিস্মৃত মাতৃ-আসক্তির মধ্যে কাটিয়েছে, সে তার বাকি সারা জীবন এমন একজন নারীকে কামনা করবে, যার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারবে, যে তাকে রাখবে, খাওয়াবে। একটি মেয়ে যদি তার বাল্যকালে কারো দ্বারা প্রলোভিত হয়ে থাকে, সে পরবর্তীকালে তার যৌনজীবনকে এমনভাবে চালিত করবে, যাতে বার বার সেই ধরনের প্রলোভনের আক্রমণকে ডেকে আনবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানসিক আঘাত-জনিত সমস্যা বুঝলে আমরা সাধারণভাবে চরিত্র-গঠনের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।

নাস্তিবাচক প্রতিক্রিয়া বিপরীত লক্ষ্যের দিকে ছোটে; এক্ষেত্রে বিস্মৃত মানসিক আঘাতের কিছুই মনে থাকে না বা পুনরাবৃত্ত হয়না। এগুলোকে আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একত্রে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এগুলো বিষয়বস্তুকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, এমন একটা প্রবণতা, যা শেষ পর্যন্ত একটা মানসিক বাধা বা ভীতিতে পর্যবসিত হয়। এই নাস্তিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলো আবার চরিত্র গঠনেও যথেষ্ট কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোও মানসিক আঘাতের ওপর আসক্তিকেই বোঝায় যেমন অস্তিবাচক প্রতিক্রিয়াতেও হয়। শুধু প্রবণতাটা থাকে বিপরীতমুখী। স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণগুলো একটা মীমাংসার ক্ষেত্র তৈরি করে, যেখানে অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক মানসিক আঘাতের এই উভয় প্রতিক্রিয়াই উপস্থিত থাকে; কখনও প্রথমটা, কখনো বা দ্বিতীয়টা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাধান করতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই : এই সমস্ত বিষয়গুলো, লক্ষণগুলো এবং ব্যক্তিত্বের বাধাগুলো, এবং চরিত্রের চিরকালীন পরিবর্তন, এগুলো বাধ্য-বাধকতার চরিত্র প্রদর্শন করে; অর্থাৎ এগুলোতে খুব বেশি মনস্তাত্ত্বিক তীব্রতা থাকে, এগুলো মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াপ্রণালীর একটা সুদূর প্রসারী স্বাধীনতা প্রকাশ করে, যেটা বাস্তব জগতের দাবীগুলো গ্রহণ করে এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তা-ভাবনার নিয়ম মেনে চলে। বহির্বিশ্বের বাস্তবতা দ্বারা এগুলো প্রভাবিত হয় না, অন্ততঃ স্বাভাবিক অবস্থাতে তো নয়ই; এগুলো বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করে না, অথবা মানসিকভাবে সদৃশ জিনিসগুলোকে আমল দেয় না, যাতে এরা সহজেই এদের সক্রিয় বিরোধিতা করতে পারে। এরা যেন একটা দেশের মধ্যে আর একটা দেশ, অগম্য, গণমঙ্গলের জন্য অযোগ্য; তবুও এরা কিন্তু তথাকথিত স্বাভাবিক উপাদানগুলোকে অতিক্রম করায় সফল হতে পারে এবং সেগুলোকে জোর করে তাদের কাজে লাগাতে পারে। যদি এটা ঘটে, তাহলেই অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক

বাস্তবতার সার্বভৌমত্ব বহির্বিশ্বের বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়; উন্মত্ততার রাস্তা খুলে যায়। যদি এতদূর না-ও হয়, এই দ্বন্দ্বের বাস্তব গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। যে সব মানুষ স্নায়বিক পীড়াক্রান্ত তাদের মানসিক বাধাগুলি, বা জীবনকে মেনে নেওয়ার অসামর্থ্য, এগুলি মনুষ্য সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই স্নায়বিক পীড়াকে তাদের অতীতে, শিশুকালে, কোনো মানসিক "আসক্তির" প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলে ধরা যেতে পারে।

আমরা যে সাদৃশ্য খোঁজার ব্যাপারে খুব আকর্ষণীয় একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম সুপ্তির কাল-এর ব্যাপারে, তার কী হল? শিশুকালের কোনো মানসিক আঘাত, সঙ্গে সঙ্গেই, সেই শিশুকালেই একটা স্নায়ুরোগের দ্বারা অনুসরিত হতে পারে: এটাকে একটা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বলে ধরা যেতে পারে এবং তার অঙ্গ হিসাবে লক্ষণগুলিও গঠিত হতে পারে। এই স্নায়বিক পীড়া দীর্ঘদিন ধরে থাকতে পারে এবং উল্লেখযোগ্য মানসিক গন্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারে, অথবা এটা একদম সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে দৃষ্টির আড়ালে। নিয়মানুসারে এইরকম স্নায়বিক পীড়ায় আত্মরক্ষা ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়; যাই হোক না কেন, ব্যক্তিত্বে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে, সেগুলির দাগ থেকে যায়। শিশুকালের স্নায়বিক পীড়া বিরামহীন ভাবে প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যেও স্নায়বিক পীড়া হিসাবে থেকে যায়, এটা কিন্তু বিরল ঘটনা। প্রায় বেশির ভাগ সময়েই শিশুকালের স্নায়বিক পীড়ার পরবর্তীকালে একটা নির্বিবাদ বিকাশ ঘটে যে প্রক্রিয়াটি শারীরতত্ত্বীয় সুপ্তিকালের জন্য সম্ভব হয় বা তার দ্বারা সংঘটিত হয়। কেবল অনেক পরবর্তীকালেই এই পরিবর্তনটির প্রকাশ ঘটে, যার সঙ্গে মানসিক আঘাতের বিলম্বিত ফল হিসাবে স্নায়বিক পীড়াটির নিশ্চিত বিস্তার ঘটে থাকে। এটা ঘটে, হয় বয়:সন্ধিকালে অথবা তার কিছু পরে। প্রথমটিতে এটি হয়, কারণ শরীরের পরিপক্কতা আসার ফলে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শক্তিশালী হয়ে যে দ্বন্দ্বে প্রথমবারে হারতে হয়েছিল, সেই দ্বন্দ্বটিতে পুনরায় যোগদান করতে পারে। আর দ্বিতীয়টিতে, স্নায়বিক পীড়ার বিকাশ পরে হয়, কারণ আত্মরক্ষার তাগিদে যে প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়েছিল, তা জীবনের নতুন সমস্যাগুলোর সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে বহির্জগতের চাহিদা এবং অহং-এর চাহিদা এই দুই-এর মধ্যে গুরুতর বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা আত্মরক্ষার লড়াই-এ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বিকশিত সংগঠনটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মানসিক আঘাতের ওপর প্রথম প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী অসুস্থতার আগমন, এই দুই-এর মাঝখানে স্নায়বিক পীড়ার সুপ্তির কালকে একটা বিশিষ্টতা বলে ধরে নিতে হবে। অসুস্থতাকে আরোগ্য হবার প্রচেষ্টা বলে ধরে নিতে হবে, বিভক্ত অহং-কে বাকি অংশের সঙ্গে সমন্বয়-সাধন করানোর প্রচেষ্টা– মানসিক আঘাতের ফলে যে বিভাজন হয়েছিল– এবং একত্র হয়ে একটা শক্তিশালী পূর্ণতা পাওয়া যাতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায়। যদিও এইরকম প্রচেষ্টা, বৈশ্লেষিক সাহায্য ছাড়া খুব কমই সফল হয়

এবং তাও সবসময় নয়। প্রায়শঃই কিন্তু এর পরিণতি ঘটে অহং-এর সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়াতে অথবা ভেঙে যাওয়াতে, অথবা যে অংশটা আগেই ভেঙে গেছে এবং মানসিক আঘাত যার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তার দ্বারা অহং-এর পরাজয়ে।

এইসব বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে পাঠককে বিশ্বাস করাতে গেলে কিছু স্নায়ুপীড়াক্রান্ত জীবনেতিহাসের একটা সামগ্রিক বর্ণনা প্রয়োজন। যদিও বিষয়টা এমনই কঠিন যে, এতে অনাবশ্যক যুক্তিতর্কের অবতারণা হবে এবং এই প্রবন্ধের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা তখন হবে স্নায়বিক পীড়ার ওপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং সেক্ষেত্রেও কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক জনের প্রত্যয় জন্মাবে যারা মনোবিশ্লেষণের পাঠ এবং চর্চার ওপর তাদের সারা জীবন নিয়োজিত করেছে। কিন্তু যেহেতু আমি এখানে বৃহত্তর জনতার সামনে বক্তব্য রাখছি, আমি শুধু আমার পাঠককে অনুরোধ করব, তিনি এই মাত্র যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটা পড়লেন, তার ওপর একটুখানি, অন্ততঃ সাময়িক বিশ্বাস রাখুন; আমি, আমার নিজের তরফ থেকে রাজি আছি যে, তিনি, আমি তাঁর সামনে যে সিদ্ধান্তগুলো দিতে চাই, সেগুলো যদি সঠিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, শুধু তখনই যেন আমার সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে নেন।

ওপরে আমি স্নায়বিক পীড়ার যে নানান্ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি, সেইগুলো পরিষ্কার বিদ্যমান আছে, এইরকম একটা ঘটনার কথা বলব। অবশ্য একটা মাত্র ঘটনায় সব কিছু বোঝা যায় না; কাজেই, যদি এই ঘটনার বিবরণী, আমরা যে সাদৃশ্য খুঁজছি তার থেকে অনেক ভিন্ন বলে মনে হয়, আমি অন্ততঃ হতাশ হব না।

একটা বাচ্চা ছেলে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারে যেমন হয়, বাবা-মা'র সঙ্গে একই শোয়ার ঘরে শুত, আর ওর কথা বলতে শুরু করার আগের বয়স থেকেই বাবা-মা'র যৌনসহবাস নিয়মিত দেখতে পেত। ও দেখেছে যেমন প্রচুর, শুনেছে আরো বেশি। ওর পরবর্তী স্নায়বিক পীড়ায়, ওর প্রথম বীর্যপতনের পরপরই যেটা দেখা গিয়েছিল, শুরুতেই এবং সবচেয়ে কষ্টকর যে লক্ষণ দেখা দেয়, সেটি হল ঘুমের কষ্ট। রাত্রি বেলা যেসব শব্দ-টব্দ হয়, ও সে সবের প্রতি দারুণ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল এবং একবার ঘুম ভেঙে গেলে, আর ওর ঘুম আসত না। এই গণ্ডগোলটা একটা সত্যিকারের আপস করার লক্ষণ; একদিকে এটা ওর রাত্রিবেলায় যা কিছু দেখেছিল তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রকাশ, অন্যদিকে, এটা আবার তার জাগ্রত থাকার অবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা, যেটাতে ওর সেই সব শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

এই সমস্ত দর্শন-শ্রবণের মাধ্যমে অল্পবয়সেই একটা আক্রমণাত্মক পুরুষত্ব এসে যাওয়ার ফলে, বালকটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার লিঙ্গটিকে উত্তেজিত করতে আরম্ভ করল এবং মা-র প্রতি একটা যৌন অগ্রসরতা দেখাতে লাগল, অর্থাৎ

এইভাবে নিজেকে তার বাবার জায়গায় বসিয়ে বাবার সঙ্গে একাত্মবোধের চেষ্টা করতে লাগল। এটা চলতেই থাকল, যতদিন না শেষ পর্যন্ত তার মা তাকে লিঙ্গ স্পর্শ করতে নিষেধ করল এবং বাবাকে বলে দেবে বলে শাসাল, এই বলে যে, তার বাবা তার লিঙ্গটা কেটে ফেলবেন। লিঙ্গ কেটে নেবার এই শাসানি কিন্তু ছেলেটার মনের ওপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ও তার লিঙ্গ নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড বন্ধ করে দিল এবং ওর স্বভাবে একটা পরিবর্তন এল। বাবার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখার বদলে ও বাবাকে ভয় পেতে আরম্ভ করল। বাবার প্রতি একটা উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করল, আর মাঝে মাঝে বাবার অবাধ্যতা করে ওকে শারীরিক নির্যাতন করার জন্যে বাবাকে উত্তেজিত করতে শুরু করল। এই শারীরিক শাস্তি ওর কাছে একটা যৌনতার সূচক হয়ে দাঁড়াল এবং এইভাবে ও তার নিপীড়িত মা-র সঙ্গে একাত্মবোধ করতে লাগল। ও মাকে আরও বেশি বেশি আঁকড়ে থাকতে শুরু করল, যেন মা-র স্নেহ ছাড়া ও একমুহূর্তও থাকতে পারবে না, কারণ এটাই ওর বাবার সেই লিঙ্গ কেটে নেওয়ার বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় বলে ও মনে করতে লাগল। সুপ্তির কালটা এইভাবে ঈডিপাস-গূঢ়ৈষা (ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স)-র একটা সামান্য পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল; এটা কোনো দৃষ্টিগোচর গোলমাল-মুক্তই রয়ে গেল। ও একটা আদর্শ শিশু হয়ে উঠল আর স্কুলেও পড়াশুনোয় সফল হল।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মানসিক আঘাতের তাৎক্ষণিক ফল পর্যালোচনা করছিলাম এবং একটা সুপ্তির কাল-এর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করলাম।

বয়ঃসন্ধিকাল আসার সাথে সাথে স্নায়বিক পীড়ারও প্রকাশ ঘটল এবং তার প্রধান লক্ষণেরও আবির্ভাব ঘটল, সেটা হ'ল যৌন অক্ষমতা। ও তার লিঙ্গের সব রকম স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল, কখনও ছুঁতেও চাইত না, আর কখনোই কোনো নারীর প্রতি যৌন আবেগ তাড়িত হয়ে যেতে চাইত না। ওর যৌন ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র মনোগত স্বমেহনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তার মধ্যে থাকত মর্ষকামী, ধর্ষকামী উদ্ভট সব কল্পনা, যার মধ্যে ওর সেই ছোটবেলায় দেখা বাবা-মা-র যৌন ক্রিয়ার ফল অতি সহজেই বোঝা যেত। বয়ঃসন্ধিকাল যে বর্ধিত পৌরুষের তেজ নিয়ে এসেছিল, তার ধাক্কায় ও তার বাবার বিরোধী হয়ে উঠল এবং বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণাও উৎপন্ন হল। বাবার সঙ্গে ওর যে এই চূড়ান্ত বিরোধিতার সম্পর্ক, যাতে ওর নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল, সেটাই কিন্তু ওর জীবনে অসফল হওয়ার কারণ এবং বহির্জগতের সঙ্গে ওর সংঘাতের কারণ। যেহেতু ওর বাবা ওকে জোর করে কোনো একটা পেশায় ঢুকিয়েছিল, সে জন্য ও নিজেকে সেই পেশায় সফল হতে দিল না। ওর কোনো বন্ধু-বান্ধবও হল না এবং ওর ওপরওয়ালাদের সঙ্গেও কোনোসময় ওর বনিবনা হল না।

এত সব দুর্লক্ষণ এবং অসফলতার বোঝা কাঁধে নিয়েও শেষ পর্যন্ত বাবার মৃত্যুর পর ও একটা মেয়েকে বিয়ে করল। এবং তারপরেই ওর চরিত্রের

মূলকেন্দ্রটা বেরিয়ে এল, এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার জন্য ওর সঙ্গে একত্রে বসবাস করাটাই দুরূহ। ও হয়ে উঠল, অত্যন্ত অহংকারী, স্বৈরাচারী আর ওর ব্যক্তিত্বে এল হিংস্রতা, স্পষ্টতঃই ওর পক্ষে অন্য লোকের ওপর চড়াও হওয়া এবং অন্য লোকদের উপর অত্যাচার করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ও হয়ে উঠল ওর বাবার হুবহু প্রতিরূপ, আর ও নিজের স্মৃতিভান্ডারকেও বাবার চেহারার অনুরূপ তৈরি করে ফেলল, অর্থাৎ ও সেই পিতা-পরিচিতি-কে পুনর্জীবিত করল যেটা, একটা শিশু হিসাবে ও যৌন উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিল। স্নায়ুপীড়ার এই অংশে, আমরা অবদমিতের ফিরে আসাটা বুঝতে পারি, যেটা মানসিক আঘাতের তাৎক্ষণিক ফল এবং সুপ্তির কাল ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা স্নায়বিক পীড়ার অত্যাবশ্যক লক্ষণগুলির মধ্যে বর্ণনা করেছি।

৪. প্রয়োগ

শুরুতেই মানসিক আঘাত– তারপর আত্মরক্ষা– তারপর সুপ্তিরকাল– তারপর স্নায়বিক পীড়ার বহিঃপ্রকাশ– সবশেষে অবদমিত বিষয়গুলির আংশিক পুনরাগমন; একটা স্নায়বিক পীড়ার বিকাশের জন্য এই সূত্রগুলি আমরা তৈরি করেছিলাম। এবার আমি পাঠককে আরও একধাপ এগোতে বলব এবং ভেবে নিতে বলব যে, মানবজাতির ইতিহাসে, একটি ব্যক্তিজীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটে, সেগুলোর অনুরূপ কিছু ঘটেছিল। অর্থাৎ, পুরো মানব জাতিটারই যৌন-আক্রমণাত্মক প্রকৃতির সংঘাতের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ হয়েছিল, যার চিরস্থায়ী চিহ্ন রয়ে গেছে, কিন্তু যেগুলো বেশির ভাগই মানবজাতি প্রতিহত করতে পেরেছিল এবং ভুলে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে, একটা দীর্ঘ সুপ্তিকালের পরে, সেগুলো আবার পুনর্জীবিত হয় এবং স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণগুলির প্রতি প্রবণতার ও গঠনের অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

আমার বিশ্বাস, আমি এই প্রক্রিয়াগুলি ঠিকঠাক সাজাতে পেরেছি এবং দেখাতে চাই যে, এদের পরিণতিই, যা স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণগুলির সঙ্গে জোরালো সাদৃশ্যযুক্ত, হচ্ছে ধর্ম নামক ব্যাপারটি। বিবর্তনবাদের আবিষ্কারের পর যেহেতু কোনো সন্দেহই নেই যে, মানবজাতিরও পূর্ব ইতিহাস ছিল আর যেহেতু এই ইতিহাসও আমাদের অজানা (বলতে গেলে, বিস্মৃত), কাজেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে। যদি আমরা জানতে পারি যে, এই কার্যকরী ও বিস্মৃত মানসিক আঘাত, এখানে এবং সেখানেও, মানব পরিবারের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাহলে এই তথ্যটিকে আমাদের একটি অপ্রত্যাশিত উপহার হিসাবে সাদরে বরণ করা উচিত, যেহেতু আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এটি আমাদের অনুমানের বাইরে ছিল।

আমার একটি বই "টোটেম অ্যাণ্ড টাবু"(১৯১২)-তে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, আমি এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করেছি, এবং তাই, সেখানে যা বলেছি, সেটাই পুনরাবৃত্তি

করতে চাই। চার্লস ডারউইনের কোনো মন্তব্য থেকেই এই যুক্তিতর্কের অবতারণা এবং এতে অ্যাট্‌কিন্‌সনের একটি সুপারিশ-ও নেওয়া আছে। এতে বলা হচ্ছে যে, সুপ্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাস করত, প্রত্যেকটি দলের অধিপতি ছিল একজন শক্তিশালী পুরুষ। এটা ঠিক কোন্ সময়ের ইতিহাস, সেটা জানা যায়না: কোনো ভূতাত্ত্বিক তথ্যাবলীও পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব, মানুষ তখন বাচন-শৈলীতেও খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। আমাদের যুক্তিতর্কের আবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে এই যে, সমস্ত আদি মানবের, আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষরাও সুতরাং এদের অন্তর্ভুক্ত, আমি এখন যা বর্ণনা করব, সেই নিয়তি বা ভাগ্যের পথে উত্তরণ ঘটেছে।

গল্পটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়েছে, যেন বাস্তবে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘটেছে এবং সেই দীর্ঘ সময়ে অগণিতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তা একবারই মাত্র ঘটেছে। শক্তিশালী পুরুষটি সমস্ত দলটির প্রভু এবং পিতা ছিল। ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, যে ক্ষমতা সে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করত। সমস্ত স্ত্রীজাতি ছিল তার সম্পত্তি, তার দলের পত্নীরা ও কন্যারা এবং তার সঙ্গে হয়ত অন্য দলের থেকে চুরি করে আনা স্ত্রীগণ। পুত্রদের ভাগ্য ছিল কঠোর; যদি ওরা পিতার ঈর্ষা বা ক্রোধ উদ্রেক করত তাহলে হয় তাদের মেরে ফেলা হত, অথবা জননেন্দ্রিয় নষ্ট করে দিয়ে পুরুষত্বহীন করে দেওয়া হত, অথবা দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। ওরা ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে বাস করতে বাধ্য হত আর সুযোগ সুবিধা মত অন্য দল থেকে স্ত্রী জাতিকে চুরি করে এনে নিজেদের পত্নী বানাত। কালক্রমে, পুত্রদের মধ্যে কোনো একটি, তাদের আসল দলে পিতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে সফল হত এবং দলটির প্রভু হয়ে যেত। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অবশ্য একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত, যেখানে সবচেয়ে কনিষ্ঠ পুত্রটি, যে মা-র স্নেহে এবং মা-র দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে বড় হত, সে, বাবা বুড়ো হয়ে গেলে বেশ সুবিধানজক জায়গায় চলে আসত এবং বাবার মৃত্যুর পরে স্বাভাবিক ভাবেই সেই জায়গা দখল করত। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বহিষ্কার এবং কনিষ্ঠপুত্রের প্রতি পক্ষপাত-এর প্রতিধ্বনি বহু পৌরাণিক কাহিনী এবং রূপকথায় রয়ে গেছে।

এই প্রথম দিকের "সামাজিক" গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য যে পরবর্তী চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা নিম্নলিখিত প্রস্তাবনার মধ্যেই রয়েছে: যে সব ভাইদের দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা একত্রে দল বেঁধে বাস করত, তারা তাদের পিতাকে পরাজিত করে, এবং সেকালের প্রথা অনুযায়ী তার মাংস সবাই মিলে খেত। এই নরমাংসভোজনের কথা শুনে চমকানোর কিছু নেই। এটার বহু পরবর্তী যুগেও অস্তিত্ব ছিল। মোদ্দাকথা হচ্ছে এই যে, আমরা সেই আদি মানবদের ওপর সেই একই অনুভূতি ও আবেগ আরোপ করতে চাইছি, যা মনোবৈশ্লেষিক গবেষণার দ্বারা আমাদের সময়ে আমাদেরই সন্তানের মধ্যে পেয়েছি। অর্থাৎ সেই আদি মানবেরা তাদের পিতাকে শুধু ঘৃণা বা ভয় করত, তাই নয়, তারা তাদের পিতাকে একজন আদর্শ হিসাবে সম্মানও করত; সত্যি বলতে কি, প্রত্যেক পুত্রই

নিজেকে পিতার আসনে বসাতে চাইত। কাজেই ওই নরমাংসভোজন ব্যাপারটা, পিতার শরীরের একটা অংশ নিজের শরীরের মধ্যে নিয়ে নিজেকে পিতার সঙ্গে একাত্ম করার একটা প্রচেষ্টা হিসাবে বোধগম্য হয়।

এটাও একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান যে, পিতাকে মেরে ফেলার পর, একটা সময় ছিল, যখন ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজের অধিকার কায়েম করতে। ওরা শেষ পর্যন্ত দেখল যে, এই লড়াইগুলো যেমন বিপজ্জনক, তেমনি অর্থহীন। এই কষ্টার্জিত পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং তারা যে একত্রে লড়াই করে মুক্তি অর্জন করেছে, সেই স্মৃতি এবং অবশ্যই, নির্বাসনকালে তাদের মধ্যে যে প্রীতি ও সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল, সেই উপলব্ধি– শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে গেল একটা সংঘবদ্ধ অবস্থা গড়ে তোলবার দিকে, একধরনের সামাজিক চুক্তি। এভাবেই সৃষ্টি হল প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সঙ্গে রইল সহজাত প্রবৃত্তি-জাত বাসনা চরিতার্থ করার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করা; পারস্পরিক কৃতজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি; প্রতিষ্ঠানটিকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল, যাকে কোনোমতেই ভাঙা যাবে না– এককথায় নৈতিকতা ও আইনের অনুশাসনের সূত্রপাত। প্রত্যেকেই নিজের পিতার স্থান দখল করার দাবী পরিত্যাগ করল, মা এবং ভগ্নীদের দখল করার বাসনা পরিত্যাগ করল। আর এর সঙ্গেই আত্মীয়দের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা এবং নিজের দলের বাইরে অসবর্ণ বিবাহের আইন চালু হল। পিতার মৃত্যুর পর, পিতার ক্ষমতার অধিকাংশটাই নারীদের দখলে চলে গেল; মাতৃতন্ত্রের যুগ শুরু হল। "ভ্রাতৃসঙ্ঘ"-এর এই সময়ে পিতার স্মৃতিটুকুই কেবল বেঁচে রইল। একটা শক্তিশালী পশু, যাকে হয়ত প্রথমে সবাই ভয় পেত, তাকে পিতার পরিবর্ত হিসাবে বেছে নেওয়া হল। আমাদের কাছে এই পশুকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষ পরবর্তীকালে নিজেদের এবং পশুদের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি করেছে তা আদি মানবদের যুগে ছিল না। আমাদের সন্তানদের কাছেও এই দূরত্ব নেই, তাদের পশুভীতিকে আমরা পিতাকে ভয় করার মতো বলে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রতীকি পশুর সঙ্গে সম্পর্কটা পিতার প্রতি যে যুগপৎ ভীতি ও সম্মানের বোধ ছিল, সেটাই বজায় রেখেছিল। এই প্রতীকি পশু একদিকে দলের দৈহিক পূর্বপুরুষ এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষার শক্তি হিসেবে বিবেচিত হত; তাকে সম্মান করা হত এবং তাকে রক্ষাও করা হত। অন্যদিকে, একটা প্রমোদানুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়েছিল, যে দিনে, সেই আদিম পিতার অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, সেই একই ব্যাপার সেই প্রতীকি পশুর অদৃষ্টেও ঘটানো হত। তাকেও মেরে ফেলা হত এবং সমস্ত ভাই-রা মিলে একত্রে সেই পশুর মাংস খেত (রবার্টসন স্মিথের বক্তব্য অনুযায়ী– টোটেম ভোজ)। এই অসাধারণ দিনটি আসলে সম্মিলিত পুত্রদের পিতার উপর বিজয় উদ্‌যাপন করার জন্য একটা বিজয়োৎসবের ভোজ।

কিন্তু এইসব ব্যাপারে ধর্ম আসছে কোথা থেকে? টোটেম-বাদ, পিতার প্রতিকল্পকে পুজো করা, পিতার প্রতি বিপরীত-ধর্মী মানসিকতার যুগপৎ বিদ্যমানতা, যেটা টোটেম-ভোজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত, স্মারক-উৎসবের প্রবর্তন এবং এমন সব আইনের প্রবর্তন, যা ভঙ্গ করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু– এই টোটেম-বাদ, আমি মনে করি, মানুষের ইতিহাসে ধর্মের প্রাচীনতম আবির্ভাব হিসাবে ধরা যেতে পারে এবং এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, একেবারে গোড়া থেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ধর্মের পরবর্তী বিকাশকে এখানে খুব অল্প কথায় বলা যায়। সন্দেহ নেই, মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের সমান্তরালে এ-ও বিকশিত হয়েছিল এবং মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল, তারও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম এগিয়ে গিয়েছিল।

টোটেম-বাদ-এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে পূজ্য প্রাণীটিকে মানুষের অবয়বে নিয়ে আসা। মানব দেবতা, টোটেমের মধ্যেই যার উৎস এবং সেটা গোপন করে ঢেকে রাখা নয়, পূর্বে পশু যে জায়গাটায় ছিল সেই জায়গাটা দখল করল। দেবতাটিকে তখনও হয় পশু হিসাবেই দেখানো হত অযথা তার মুখটা অন্তত: পশুর মুখ ছিল: টোটেমটি দেবতার একজন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হতে পারে, অথবা আবার পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতা পশুটিকে পরাজিত করত, যে পশুটা সেই দেবতারই পূর্ববর্তী ছাড়া আর কেউ নয়। একটা সময়ে– বলা শক্ত ঠিক কোন্ সময়ে– মহান মাতারূপী দেবীরও আবির্ভাব হল, বোধ হয় পুরুষ দেবতাদের আগে, এবং তাদেরও দেবতাদের সঙ্গে পুজো করা হত দীর্ঘদিন পর্যন্ত। সেই সময়কালে একটা বিশাল সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। মাতৃতন্ত্রকে সরিয়ে আবার পিতৃতন্ত্র পুন: প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন পিতারা কিন্তু, সত্যি বলতে কী, কখনোই সেই আদিম যুগের পিতার মতো সর্বশক্তিমান হয়ে উঠতে পারেনি। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি এবং আদি যে দলটি ছিল তার চেয়েও বড় সম্প্রদায়ে ছিল এদের বসবাস। তাদের একজনকে আরেকজনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হত এবং তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হত। বোধ হয় মাতৃতন্ত্র যখন সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তখন মাতৃরূপা দেবীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, যাতে সিংহাসন-চ্যুত মাতাদের ক্ষতিপূরণ করা যায়। প্রথমদিকে পুরুষ দেবতারা দেবীদের পাশে, তাদের সন্তান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল; পরে তারা খুব স্পষ্টভাবেই পিতার চরিত্র নিয়েছিল। বহু ঈশ্বরবাদের এই পুরুষ দেবতারা, পিতৃতন্ত্রের আমলের পরিস্থিতির প্রতিবিম্ব মাত্র। তারা ছিল সংখ্যায় অনেক, তাদের কর্তৃত্ব তাদের ভাগ করে নিতে হত, এবং কখনও কখনও তাদের অন্য কোনও উঁচু স্তরের দেবতাকে মেনে চলতে হত। পরবর্তী ধাপ আমাদের সেই প্রসঙ্গে নিয়ে যাবে, যাতে আমাদের আগ্রহ আছে: তা হল, এক এবং একমাত্র পিতৃরূপী দেবতা, যার ক্ষমতা অসীম, তার প্রত্যাবর্তন।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই ঐতিহাসিক সমীক্ষায় অনেক ফাঁক-ফোকর আছে, এবং অনেক বিষয়ে আরো স্পষ্টীকরণ দরকার। তবুও যে কেউ এই আদিম ইতিহাসের পুনর্নির্মাণকে অতি চমৎকার বলে ঘোষণা করলেও অত্যন্ত কম বলা হবে, তার কারণ এর বৈভব ও সমৃদ্ধি এবং এর পেছনে থাকা শক্তিশালী প্রমাণগুলো প্রাচীনকালের একটা বড় অংশ, যা বর্তমানে একটা সম্পূর্ণতা পেয়েছে, সেগুলো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত অথবা আজ পর্যন্ত তার কিছু চিহ্ন দেখা যায়, যেমন মাতৃশাসনের অধিকারগুলো, টোটেম-বাদ এবং পুরুষ সম্প্রদায়গুলো। অন্যান্য আরো কিছুও উল্লেখযোগ্য প্রতিরূপের মধ্যে বেঁচে আছে। এইজন্যে একাধিক লেখক অবাক হয়ে দেখেছেন, খ্রিস্টান প্রার্থনা সভা বা সান্ধ্যভোজের পর্বকালীন যে ধর্মীয় আচার পালন করা হয়– যেখানে ধর্মবিশ্বাসী ভক্ত তার ঈশ্বরের রক্ত এবং মাংস প্রতীকিরূপে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে টোটেম ভোজের, যার অন্তর্নিহিত অর্থ খ্রিস্টিয় ধর্মীয় আচারকেই প্রতিফলিত করে, কী অসাধারণ মিল। আমাদের বিস্মৃত প্রাচীন ইতিহাসের অসংখ্য টিকে থাকার নমুনা জাতির পৌরাণিক কাহিনী, গল্প-গাথা, রূপকথার মধ্যে সংরক্ষিত আছে এবং একটি শিশুর মানসিক জীবনের বৈশ্লেষিক পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিত মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে, যার দ্বারা প্রাচীনতম যুগ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে অনেক খালি জায়গা ভরাট করা গেছে। পিতা এবং পুত্রের মধ্যে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ, সেটা বোঝানোর জন্য আমি কেবলমাত্র শিশুর পশুভীতির কথা বলব, পিতা খেয়ে ফেলবে, সেই ভয় (বয়স্ক মনের কাছে এটা অস্বাভাবিক মনে হবে) এবং পুরুষত্ব-হীনতা হয়ে যাবার ভয়ে সাংঘাতিক মানসিক জটিলতার কথা বলব। আমাদের ইতিহাসের এই পুনর্নির্মানের মধ্যে কোনো কিছু বানানো হয়নি, যা কিছু রয়েছে সব সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ধরে নেওয়া যাক, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে, সব বিশ্বাসযোগ্য। তাহলে ধর্মীয় আচরণ ও মতবাদের মধ্যে দুটো বিষয় চিনতে পারা যাচ্ছে: একদিকে পুরোনো পারিবারিক ইতিহাসের ওপর আত্যন্তিক আসক্তি এবং সেটা টিকে থাকা; অন্যদিকে অতীতের পুনরাবৃত্তি এবং বিস্মৃত বিষয়ের দীর্ঘকাল পরে পুনরাগমন। এই পরের ব্যাপারটাই এখন পর্যন্ত অবহেলা করা হয়েছে এবং সেজন্যই সঠিক বোধগম্য হয়নি। এখন তাই এই ব্যাপারটাকে অন্তত: একটা জোরালো উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, বিস্মৃত অতীত থেকে ফিরে আসা প্রতিটি স্মৃতিই অত্যন্ত জোরালো হয়ে ফিরে আসে, একটা অতুলনীয় জোরালো প্রভাব ফেলে জনসাধারণের ওপর, আর মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য অপ্রতিরোধ্য দাবী পেশ করে, যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই খাটে না। এই যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, এটাকে কেবলমাত্র মানসিক বিকারগ্রস্তের ভ্রান্তির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে। এটা দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত যে, মানসিক ভ্রান্তির ভেতরও একটুকরো বিস্মৃত সত্য থাকে, যেটা ফিরে আসলে

বিকৃত হবার বা ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে এবং এই সত্যের কেন্দ্রস্থল থেকেই ভ্রান্তির অন্তর্গত বাধ্যতামূলক প্রত্যয় উদ্ভূত হয় এবং যে ভুল দিয়ে সেটা ঢাকা থাকে, তাতে ছড়িয়ে পড়ে। এইরকম প্রগাঢ় সত্য– যাকে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলতে পারি– বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যেও পাওয়া যাবে। অবশ্য এটা সত্যি যে, এতে মনোবিকার-এর লক্ষণের যে চরিত্র, তা রয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু এটা জনগণের ব্যাপার, তাই এতে বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ লাগেনি।

ধর্মীয় ইতিহাসের অন্য কোনো অংশ এতবেশি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি, যেমন হয়েছে ইহুদি জাতির মধ্যে। একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং খ্রিস্টানধর্মের মধ্যে এর অনুবৃত্তি– অবশ্য যদি আমরা পশুটোটেম থেকে তার নিয়মিত (পশু) সঙ্গীসহ মানবদেবতায় বিকাশকে বাদ দিই, এমন একটা বিকাশ যা অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা যায় এবং চটজলদি বোঝাও যায়। (চারজন খ্রিস্টান ভগদ্বাক্য-প্রচারকদের প্রত্যেকেরই এখনও একটি পছন্দের পশু আছে)। যদি আমরা এক মুহূর্তের জন্যে ধরেও নিই যে, একেশ্বরবাদের ধারণার উদ্ভবের পেছনে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে, ফারাও সাম্রাজ্যের শাসন, তাহলে আমরা দেখব যে এই ধারণা নিজের দেশের জমি থেকে উৎখাত হয়ে অন্যজাতির জমিতে রোপিত হয়েছে– একটা দীর্ঘ সুপ্তির কালের পরে সেই জাতিকে ধরে নিয়েছে, তারা একে তাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করেছে এবং এই জাতিকে মনোনীত জাতি হওয়ার গৌরব প্রদান করে বাঁচিয়ে রেখেছে। এটা সেই প্রাচীন যুগের পিতার ধর্ম এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরস্কার, সম্মান এবং সবশেষে, বিশ্ব সার্বভৌমত্ব-র প্রত্যাশা। শেষ কথাটি হচ্ছে একটি ইচ্ছা-সুখের কল্পনার ফানুস– দীর্ঘদিন আগে ইহুদিরা যা পরিত্যাগ করেছিল– যেটা আজো তাদের শত্রুদের মধ্যে বেঁচে আছে "জিয়নের বয়স্ক"-দের ষড়যন্ত্রের ওপর বিশ্বাসের মধ্যে। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে আমরা দেখব, একেশ্বরবাদী ধর্মের বিশিষ্টতাগুলো, যা ইজিপ্ট থেকে ধার করা হয়েছিল। সেগুলো কেমন করে ইহুদি জাতির ওপর কার্যকরী হল, কেমন করে ভোজবাজী, অতীন্দ্রিয়তা ইত্যাদি অবজ্ঞা ও পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের চরিত্র চিরকালের জন্য গঠন করল এবং আধ্যাত্মিকতা ও পরমানন্দ লাভে প্রোৎসাহিত করল। ইহুদি জাতি, তাদের হাতের মুঠোয় সত্য, এই আত্মবিশ্বাসে সুখী, ও তারা ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক, এই সচেতনতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও নৈতিক কীর্তিগুলোকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচনা করতে লাগল। আমি আরো দেখাব যে, কেমন করে তাদের দুর্ভাগ্য এবং বাস্তব তাদের জন্য যে হতাশা জমা করে রেখেছিল, তা তাদের উপরোক্ত প্রবণতাগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। বর্তমানে অবশ্য আমরা অন্য আর একদিকে ওদের ঐতিহাসিক বিকাশকে অনুসরণ করব।

প্রাচীন পিতার যে ঐতিহাসিক অধিকারগুলি ছিল, সেগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটা লক্ষণীয় অগ্রগতি সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই তো শেষ কথা হতে পারে

না। প্রাগৈতিহাসিক সেই দুঃখদায়ক কাহিনীর অন্যান্য অংশগুলোও স্বীকৃতি পাবার জন্য হৈচৈ তুলতে পারে। এই ব্যাপারটা কীভাবে শুরু হয়েছিল, বলা মুস্কিল। মনে হয় একটা ক্রমবর্ধমান অপরাধবোধ ইহুদি জাতিটাকে ছেয়ে ফেলেছিল– হয়তো তদানীন্তন পুরো সভ্যতাটাকেই– অবদমিত বিষয়বস্তুগুলির ফিরে আসার অগ্রদূত হিসাবে। এই ভাবেই চলেছিল, যতদিন না এই ইহুদি জাতিরই একজন, এক রাজনৈতিক ধার্মিক আন্দোলনকারীর ছদ্মবেশে একটা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করলেন– যেটা, অন্য আরেকটার সঙ্গে, খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে– ইহুদি ধর্মকে আলাদা করে দিল। পল, ট্যারস্যাস-এর একজন রোমান ইহুদি, এই অপরাধবোধের প্রাচীন উৎস সঠিকভাবে সন্ধান করে বার করলেন। সেটাকে তিনি নাম দিলেন, আদি পাপ; সেটা ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ যেটার স্খলন হবে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। এই আদি পাপের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীতে মৃত্যুর আবির্ভাব। বাস্তবে, এই অপরাধ, যার পরিণাম মৃত্যু, সেটা হচ্ছে পিতাকে মেরে ফেলা, যে পিতাকে পরবর্তীকালে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছিল। সেই নৃশংস খুন করাটা কিন্তু মনে রাখা হয়নি; তার পরিবর্তে পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্ভট কল্পনা এসে গেল, এবং তাই, এই উদ্ভট কল্পনাকেই নরকবাস থেকে উদ্ধার পাওয়ার যে খ্রিস্টিয় উপদেশাবলী (ইভাঞ্জেল), সেই রূপেই অভ্যর্থিত হল। ঈশ্বরের এক পুত্র, নিজে নির্দোষ, আত্মোৎসর্গ করলেন এবং এভাবেই পৃথিবীর সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন। এক্ষেত্রে, একজন পুত্র হতেই হবে, কেননা, পাপটা ছিল পিতৃহত্যা। হয়ত প্রাচ্য এবং গ্রিক অতীন্দ্রিয়তা এই মুক্তিদানের উদ্ভট কল্পনার রূপ পরিগ্রহ করাতে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে এর মূল নির্যাসটা পল-এর নিজের অবদান বলে মনে হয়। পল্-এর ধর্মের ব্যাপারে একটা সহজাত বোধ ছিল। অতীতের আবছা স্মৃতি তাঁর অন্তরাত্মায় ছিল এবং সেটা চেতনার আলোয় বিকশিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এই যে ত্রাণকর্তা নিজেই নির্দোষ হয়েও আত্মোৎসর্গ করলেন, এটা একটা খাঁটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্যবিকৃতি, যেটা যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার সাথে মেলানো যায়না। যে লোক নিজে নিরপরাধ সে কেমন করে হত্যাকারীর অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়ে নিজেকে খুন হতে দেবে? ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এরকম কোনো পরস্পরবিরোধীতা নেই। সবচেয়ে বড় অপরাধী ছাড়া অন্য কেউ "ত্রাণকর্তা" হতেই পারে না, যে ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের নেতা ছিল এবং পিতাকে পরাজিত করেছিল। এরকম কোনো মুখ্য বিদ্রোহী এবং নেতা ছিল কিনা, সেটা আমার মতে, অনিশ্চিতই থেকে যায়। এটা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু আমাদের এটাও দেখতে হবে যে, ভ্রাতৃ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যেরই ওই কাজটা নিজেই করার আকাঙ্খা ছিল, তাতে ওর নিজের পিতার সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য এবং পিতার পরিবর্ত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা অনুপম সুযোগ তৈরি হত। যেটা অবশ্য তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, যখন তাকে সম্প্রদায়ের

মধ্যে মিশে যেতে হয়েছিল। যদি সেইরকম কোনো নেতা না থেকে থাকেন তাহলে যিশুখ্রিস্ট একটা অপূর্ণ ইচ্ছা-কল্পনার উত্তরাধিকারী ছিলেন; আর যদি সেইরকম কোনো নেতা থেকে থাকেন, তাহলে যিশুখ্রিস্ট তার উত্তরাধিকারী এবং তার অবতার ছিলেন। ব্যাপারটা একটা কল্পনাবিলাস, না বিস্মৃত বাস্তবের প্রত্যাবর্তন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; যাই হোক না কেন, এখানেই কিন্তু একজন নায়কের সম্বন্ধে একটা ধারণার সৃষ্টি– যে নায়ক তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং যে কোনো ছদ্মবেশে বা অন্য কোনো ভাবে পিতাকে হত্যা করে। নাটকে নায়কের যে "বিয়োগান্তমূলক অপরাধ," তার আসল সূত্রপাতও কিন্তু এখানেই– অন্যভাবে এই অপরাধকে বোঝানো অত্যন্ত শক্ত। সন্দেহ নেই যে, গ্রিক বিয়োগান্ত নাটকে, নায়ক এবং তার সম্প্রদায় ওই একই বিদ্রোহী নায়ক ও তার ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়কেই বোঝায় এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, মধ্যযুগে যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণাকাতরতা ও মৃত্যুর দৃশ্য দিয়েই থিয়েটার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে।

আমি আগেই বলেছি যে, খ্রিস্টানদের যিশুখ্রিস্টের শেষ সান্ধ্যভোজ উৎসব, যাতে ভক্তরা ত্রাণকর্তার রক্ত ও মাংস গ্রহণ করে নিজ শরীরে স্থাপনা করে, সেটা সেই সুপ্রাচীন টোটেম-ভোজের বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি; পরবর্তী ভোজটা অবশ্য কোমলতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয়, আক্রমণাত্মকভাবে নয়। পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে যে বিপরীত ধর্মী শক্তির যুগপৎ অবস্থান তা ধর্মের নব নব বিকাশ ও উদ্ভাবনের চূড়ান্ত পরিণামের মধ্যে স্পষ্টই বোঝা যায়। পিতৃদেবতাকে প্রসন্ন করার বদলে পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করা এবং সরিয়ে দেওয়াটাই শেষে ঘটে। মোজেইক ধর্মটা ছিল পিতা ধর্ম; ক্রিশ্চিয়ানিটি হল পুত্র ধর্ম। পুরোনো ঈশ্বর, পিতা, দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করল; খ্রিস্ট, পুত্র, তার জায়গা গ্রহণ করল, যেমন সেই অন্ধকার যুগে প্রত্যেক পুত্রই করতে চাইত। পল, ইহুদি ধর্মকে আরো বিকশিত করে, তারই ধ্বংসকর্তা হয়ে দাঁড়াল। তার সাফল্য এসেছিল এই কারণে যে, সে ত্রাণ করার ধারণার মধ্যে দিয়ে অপরাধবোধের ভুতটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল। তাছাড়াও কারণ ছিল, ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, এই ধারণাটাকে সে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তার প্রত্যক্ষ প্রতীক, সুন্নৎ প্রথাকেও বিসর্জন দিয়েছিল। এইভাবেই নতুন ধর্মটি সর্বগ্রাহী, বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। যেহেতু ইহুদিরা পলের এই নব উদ্ভাবনের ধর্মের বিরোধিতা করছিল, তাই প্রতিশোধ স্পৃহায় পল এই পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুরোনো আটন ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা হচ্ছে বিশ্বজনীনতা; একটা বাধা সরানো হয়েছিল, যেটা ধর্মের নতুন বাহক, ইহুদি জাতির মধ্যে প্রসারিত হবার সময় এসেছিল।

কিছু কিছু ব্যাপারে এই নতুন ধর্মে কিন্তু সংস্কৃতির পশ্চাদগামীতা দেখা যায় পুরোনো ইহুদি ধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে; এই ধরনের ব্যাপার নিয়মিতই প্রায়

ঘটে থাকে, যখন নিচু সাংস্কৃতিক মানের নতুন কোনো সম্প্রদায় কোনো পুরোনো সংস্কৃতিকে দখল করে, বা, তার মধ্যে প্রবেশ করে। খ্রিস্টান ধর্ম, যে উচ্চতায় ইহুদি ধর্ম উঠেছিল, সেই আধ্যাত্মিক উচ্চতায় উঠতে পারেনি। তাছাড়া খ্রিস্টান ধর্ম আর পাকাপোক্ত একেশ্বরবাদীও ছিল না: আশপাশের অন্যান্য লোকেদের কাছ থেকে অনেক রকম প্রতীকি আচার-আচরণ গ্রহণ করেছিল, মহান মাতৃ দেবীরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সহজবোধ্য ছদ্মবেশে বহুঈশ্বরবাদীদের অনেক দেবতাকেও নিজের মধ্যে ঠাঁই দিয়েছিল, যদিও তাদের স্থান ছিল নীচের দিকে। সব থেকে বড় কথা, এই ধর্ম কিন্তু আটন ধর্ম বা পরবর্তী মোজেইক ধর্মের মতো, মোটেই অগম্য ছিল না, এতে প্রচুর কুসংস্কার, ভোজবাজি, অতীন্দ্রিয়বাদ ঢুকে গিয়েছিল, যেগুলো পরবর্তী দু-হাজার বছরে এই ধর্মের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খ্রিস্টান ধর্মের এই যে জয়, এটা প্রায় দেড়হাজার বছর পরে একটা বিশাল অঞ্চল জুড়ে আম্মন পুরোহিতদের ইখ্‌নাতনের ঈশ্বরের ওপর নতুন করে বিজয় প্রাপ্তি। এবং তা সত্ত্বেও, ধর্মের ইতিহাসে খ্রিস্টানধর্ম একটা অগ্রগতি নির্দেশ করেছিল: অর্থাৎ কিনা, উৎপীড়িতের পুনরভ্যুত্থান। এখন থেকে ইহুদি ধর্ম বলতে গেলে ফসিল হয়ে রইল।

এটা বোঝা দরকার যে, একেশ্বরবাদের ধারণা কেবলমাত্র ইহুদি জাতির ওপরই এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল কেন, এবং ইহুদিরা কেন এত নাছোড়বান্দার মত একে আঁকড়ে ধরেছিল। আমার বিশ্বাস, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। প্রাচীন কালের সেই সব মহান কর্ম এবং অপকর্মগুলো, পিতৃহত্যা, এগুলি ইহুদিদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কারণ নিয়তি নির্দিষ্ট ছিল যে, ওরা মোজেসের ওপর এই ব্যাপারটা পুনঃপ্রয়োগ করবে, আর মোজেস ছিলেন একজন বিশিষ্ট পিতৃপ্রতিকল্প। এটা ছিল ঘটনাটা স্মরণ করার পরিবর্তে ঘটনাটা ঘটানো, যেটা স্নায়ুপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশ্লেষণী কাজ করার সময় প্রায়ই হয়ে থাকে। ওরা মোজেসের মতবাদের প্রতি সাড়া দিয়েছিল– যেটা ওদের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল– ওদের কর্মকে অস্বীকার করে, মহান পিতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে আর এগোতে পারেনি এবং অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, যেখান থেকে পরবর্তীকালে পল প্রাচীন ইতিহাসের ওপর তার অনুবৃত্তি শুরু করেছিল। আরেকজন মহান ব্যক্তির নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনা থেকে পল একটা নতুন ধর্ম সৃষ্টি করবে, এটা কিন্তু নেহাৎ-ই একটা দৈব-সুযোগ নয়। এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে জুডিয়ার মুষ্টিমেয় অনুগামী ভক্ত ঈশ্বরের পুত্র বলে এবং প্রতিশ্রুত অবতার বলে বিশ্বাস করত এবং যে পরবর্তীকালে মোজেসের বাল্যকালের ইতিহাসকে নিজের বলে চালিয়েছিল। বাস্তবে অবশ্য আমরা ওর সম্বন্ধে আর স্পষ্ট কিছু জানিনা, যতটা আমরা মোজেস সম্বন্ধে জানি। আমরা জানি না সে সত্যিই খ্রিস্টিয় উপদেশাবলী বর্ণিত মহান পুরুষ ছিল কিনা অথবা

তার মৃত্যুর ঘটনা বা পরিস্থিতিই, তার এই গুরুত্ব পাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কার্যকরী হয়েছিল কিনা। পল, যে কিনা তার প্রচারক হয়েছিল, সে নিজেও তাকে জানত না।

মোজেসের অনুগামীদের দ্বারাই মোজেসের হত্যা– যেটা সেলিন, ঐতিহ্যের যে সামান্য চিহ্নটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং যেটা, আশ্চর্য ব্যাপার, যুবক গ্যেটেও কোনো প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন, এটাই আমাদের যুক্তিধারার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রাচীন কালের বিস্মৃত ঘটনাবলী এবং পরবর্তীকালে একেশ্বরবাদী ধর্মের রূপে এর পুনরাগমনের মাঝখানে এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। এটা একটা আকর্ষণীয় প্রস্তাবনা যে, মোজেসের হত্যার সঙ্গে যে অপরাধবোধ জড়িয়ে আছে, সেটাই ত্রাণকর্তার ইচ্ছা-কল্পনার উদ্দীপক হতে পারে, যে ত্রাণকর্তার পুনরভ্যুত্থান হবে এবং তিনি এসে তাঁর লোকেদের উদ্ধার করবেন এবং পৃথিবীর ওপর তাঁর প্রতিশ্রুত সার্বভৌমত্ব দেবেন। মোজেস যদি প্রথম ত্রাণকর্তা হন, তাহলে যিশুখ্রিস্ট হলেন তাঁর প্রতিকল্প এবং উত্তরাধিকারী। তাহলেই পল জাতির উদ্দেশ্যে জোরগলায় বলতে পারবেন, "দেখ, সত্যিই ত্রাণকর্তা এসে গেছেন। তিনি তোমাদের চোখের সামনেই নিহত হলেন।" তাহলে খ্রিস্টের পুনর্জন্মের মধ্যেও কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে, কারণ তিনিই পুনরুত্থিত মোজেস এবং সেই সুপ্রাচীন গোষ্ঠীগুলোর সুপ্রাচীন পিতাও তিনি– শুধু রূপান্তরিত এবং পিতার পরিবর্তে, পুত্র হিসাবে আবির্ভাব।

বেচারা ইহুদি জাতিটা, তাদের ঘাড়-শক্ত করা গোঁয়ার্তুমি নিয়ে তাদের "পিতৃস্বরূপ"-এর হত্যাকে অস্বীকার করেই চলেছিল, তাদের পরবর্তী কত শতাব্দী ধরে কী পরিমাণ খেসারত দিতে হল। বারবার তাদের সেই একই তিরস্কার শুনতে হল, "তোমরা আমাদের ঈশ্বরকে হত্যা করেছ।" এবং এই তিরস্কার সত্য, যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়। ধর্মের ইতিহাসের প্রসঙ্গে এই তিরস্কার বলে, "তোমরা ঈশ্বরকে হত্যা করেছ, সেটা কিছুতেই স্বীকার করবেনা" (ঈশ্বরের আদিরূপ, প্রাচীন কালের পিতা, এবং তাঁর পুনরায় দেহধারণ)। আরো কিছু যোগ করা উচিত, যেমন : "এটা সত্যি যে, আমরা সেটা করেছিলাম, কিন্তু আমরা তো তা স্বীকারও করে নিয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আমাদের শুদ্ধিকরণও তো হয়ে গেছে।" ইহুদি জাতির বংশধরদের সেমিটিজ্‌ম বিরোধীরা যত অভিযুক্তই করুক না কেন, সব অভিযোগ কিন্তু এরকম ভালো ভালো কথাতেই শেষ হয়ে যায় না। ইহুদিদের প্রতি যে ঘৃণা, তার তীব্রতা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলার মতো এরকম একটা ব্যাপারের পেছনে নিশ্চয়ই একাধিক কারণ আছে। এর প্রচুর কারণ খুঁজে বের করা যায়। তার মধ্যে কিছু কিছু যার কোনো ব্যাখ্যা দরকার হয় না, বোধগম্য বিচার-বিবেচনা প্রসূত। অন্যগুলি গভীরে নিহিত এবং গোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসে, যেটাকে বিশেষ উদ্দেশ্য

বলা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রতারণাপূর্ণ হচ্ছে ইহুদিদের বিদেশি বলে ভর্ৎসনা করা যেহেতু অনেক জায়গাতেই আজকাল সেমিটিজ্‌ম-বিরোধী ধুয়ো তোলা হয়, যদিও ইহুদিরা জনসংখ্যার প্রাচীনতম অংশ অথবা বর্তমান অধিবাসীরা আসার আগেই সেখানে এসেছিল। যেমন, কোলোন শহরে, যেখানে রোমানদের সঙ্গেই ইহুদিরা এসেছিল, জার্মানীয় উপজাতিরা উপনিবেশ বানানোর আগেই। সেমিটিজ্‌ম-বিরোধীদের অন্যান্য কারণগুলো জোরালো, যেমন, ইহুদিরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে বেশির ভাগ সময়েই সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করে সেই পরিস্থিতি, যেহেতু জনগণের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বোধকে সম্পূর্ণ করতে গেলে, কোনো বহিরাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতাচারণ করা দরকার এবং সংখ্যালঘুদের এই সংখ্যায় কম হওয়ার দুর্বলতাকে দমন করা দরকার। আরো দুটো বৈশিষ্ট্য যা ইহুদিদের আছে, সেগুলো অবশ্য ক্ষমার যোগ্য নয়। প্রথমটি হচ্ছে, নানান বিষয়ে তারা "গৃহকর্তার" থেকে আলাদা। হয়ত, মূলগতভাবে নয়, যেহেতু তারা বিদেশি এশিয়ান জাতি নয়, যেটা তাদের শত্রুরা ভাবে এবং ওরা বেশির ভাগই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলীয় জাতিদের অবশিষ্টাংশ এবং তাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। তবুও তারা আলাদা– যদিও সময় সময়, কেন এবং কীভাবে, কোন বিষয়ে তারা আলাদা, এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না– বিশেষ করে নর্ডিক জাতির লোকেদের থেকে, এবং জাতিগত অসহিষ্ণুতা, বলতে অবাক লাগে, সামান্য সামান্য পার্থক্যে, মৌলিক কোনো পার্থক্যে নয়, বড় বেশি প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের এর চেয়েও বেশি, সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ওরা অত্যাচারকে গ্রাহ্য করে না, এমনকি সবচেয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন করেও ওদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। উল্টো, বাস্তব জীবনে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা যে ওদের আছে, তা ওরা দেখিয়েছে এবং সেখানে ওদের মেনে নেওয়া হয়েছে, সেখানে ওরা চতুষ্পার্শ্বের সভ্যতায় মূল্যবান অবদান রেখেছে।

সেমিটিজ্‌ম্ বিরোধিতার গভীর উদ্দেশ্যের শিকড় সুপ্রাচীন অতীতের গহ্বরে নিহিত আছে: সেগুলো আসে অচেতন থেকে, আমি একথা শুনতে প্রস্তুত যে, এখন আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হবে। আমি জোর গলায় বলতে চাই যে, ইহুদিরা পিতা পরমেশ্বরের প্রথম-জাত, প্রিয় পুত্র এই কথা বলে ওরা যে অন্যদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেছিল, সেটা এখনও সেই অন্যেরা জয় করতে পারেনি, বোধহয় ওরা ওই ধারণাটাকে বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছিল। এছাড়া, যে সমস্ত প্রথা পালন করে ইহুদিরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল, তার মধ্যে রয়েছে সুন্নৎ-প্রথা, যেটা অন্যদের ওপর একটা বিতৃষ্ণামূলক, ভুতুড়ে ছাপ ফেলেছিল। এর ব্যাখ্যা হয়ত এই হতে পারে যে, সুন্নৎটা ওদের সেই বিভীষিকাময় পুরুষত্বহীন করার ধারণাটা এবং সেই সুপ্রাচীন অতীতের অন্যান্য বিষয়গুলোর কথা, যা ওরা ভুলতে চায়, তা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সবশেষে

আসছে, একদম হাল আমলের উদ্দেশ্যটার কথা। ভুললে চলবেনা যে, যারা বর্তমানে সেমিটিজম-বিরোধিতা করছে, তারা তুলনামূলকভাবে হাল আমলেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, কখনো বা রক্তঝরানো বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ায়। বলা যায়, যে এদের খুব "খারাপভাবে খ্রিস্টান" করা হয়েছে: আর খ্রিস্টান ধর্মের এই পাতলা আস্তরণের তলায়, ওরা, ওদের পূর্বপুরুষরা যা ছিল, তাই আছে, অর্থাৎ বর্বরভাবে বহু ঈশ্বরবাদী। যে নতুন ধর্ম তাদেরকে জোর করে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তার ওপর ওদের রাগ ওরা এখনও ভুলতে পারেনি এবং তাই ওরা রাগটা, যে উৎস থেকে খ্রিস্টানধর্ম ওদের কাছে এসেছে, তার ওপরই উগ্‌রে দিয়েছে। যিশুখ্রিস্টের উপদেশাবলী একটি গল্প বলে, যা ইহুদিদের মধ্যেই অভিনীত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদেরই কথা তাতে বলা হয়, এই সত্যটাই উপরোক্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে। ইহুদি ধর্মের প্রতি ঘৃণা আসলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি ঘৃণা, এবং অবাক্ হবার কিছু নেই যে, জার্মান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে, এই দুই একেশ্বরবাদী ধর্মের নিকট যোগসূত্র থাকায়, দুটির প্রতিই শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করা হয়।

৫. প্রতিবন্ধকগুলি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্নায়বিক পীড়াঘটিত প্রক্রিয়াগুলির এবং ধর্মীয় ঘটনাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বোধহয় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাতে ধর্মীয় ঘটনাগুলির অপ্রত্যাশিত উৎসগুলির দিকেও নির্দেশ করা গেছে। ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব থেকে জনগণের মনস্তত্ত্বে এই উত্তরণে দুটো প্রতিবন্ধকতা সামনে আসে, তাদের চরিত্র আলাদা, গুরুত্ব আলাদা, সেগুলি আমরা এখন পরীক্ষা করব। প্রথমটি হচ্ছে, আমরা এখানে ধর্মের বিশাল ভান্ডার থেকে কেবল একটি ধর্ম নিয়েই আলোচনা করেছি এবং অন্যান্যগুলির ওপর কোনো আলোকপাত করিনি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমি একটার বেশি নমুনা দিতে পারব না এবং আমার এই তদন্ত সম্পূর্ণ করার মতো প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ-সুলভ জ্ঞান নেই। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে বলতে পারি যে, মোহাম্মদীয় ধর্মের প্রবর্তন আমার কাছে মনে হয়েছে যেন ইহুদি ধর্মেরই সংক্ষেপিত পুনরাবৃত্তি, যাকে অনুকরণ করে, এটার আবির্ভাব হয়েছিল। এটা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদ (সঃ) প্রথমে নিজের এবং তাঁর জাতির জন্যে ইহুদি ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। একজন মহান আদি পিতাকে পুনঃপ্রাপ্ত করায়, আরবদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসে দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল, যার ফলে ওরা বিশাল বিশাল পার্থিব সফলতার অধিকারী হয়েছিল, কিন্তু সেটাই আবার এই সব করতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। যাহ্‌ভে তাঁর সময়ে যতখানি ছিলেন, তার চেয়ে আল্লাহ্ অনেক বেশি তাঁর নির্বাচিত জাতির কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। নতুন

এই ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিকাশ কিন্তু শীঘ্রই স্তব্ধ হয়ে গেল, কারণ হয়ত, এই ধর্মের মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান ছিল না, যা ছিল ইহুদি ধর্মের মধ্যে, তার প্রবর্তকের হত্যার কারণে যা উদ্ভূত হয়েছিল। প্রাচ্যের যে আপাতঃ যুক্তিবাদী ধর্মগুলি ছিল তা মূলতঃ পূর্বজদের পূজা ছিল; কাজেই সেই ধর্মগুলি অতীতের পুনর্গঠনের শুরুর দিকেই থেমে গিয়েছিল। যদি একথা সত্যি হয় যে, আমাদের সময়ের আদিম জাতিদের মধ্যে আমরা দেখি যে, তাদের ধর্মের একমাত্র বিষয় হচ্ছে একজন সর্বোচ্চ সত্তার পূজা, তাহলে আমরা এটাকে ধর্মের বিকাশের শুকিয়ে যাওয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এখান থেকে নিদানিক মনস্তত্ত্বে যে অসংখ্য প্রাথমিক স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ততা দেখতে পাই, তার সঙ্গে একটা সমান্তরাল টানতে পারব। এখানে এবং সেখানেও কেন আর কোনো বিকাশ ঘটল না, আমরা বুঝতে পারি না। এই সব জাতির ব্যক্তিগত মেধাকেই, তাদের ক্রিয়াকলাপ যে দিকে এগোয় তার জন্য এবং তাদের সাধারণ সামাজিক অবস্থার জন্য দায়ী করব। তাছাড়া, বিশ্লেষণের কাজে, একটা সুবিধাজনক নিয়ম আছে, তা হল, যা আছে তাকে ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকা, যা ঘটেনি, তাকে ব্যাখ্যা করতে না যাওয়া।

জনগণের মনস্তত্ত্বে উত্তরণ ঘটার পথে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা অনেক বেশি উল্লেখনীয়, কারণ এতে একটা নতুন মৌলিক সমস্যা রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে যে, জাতির জীবনে সক্রিয় ঐতিহ্য কোন্ রূপে এখনও বিদ্যমান আছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন কোন প্রশ্নও ওঠেনা, কারণ এক্ষেত্রে অচেতন মনে অতীতের স্মৃতির কিছু চিহ্নের অস্তিত্ব থাকার ফলে ব্যাপারটা মিটে যায়। আমাদের ঐতিহাসিক উদাহরণের ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া যাক। আমি বলেছিলাম যে, কাদেশ এর আপস-মীমাংসা, যে জাতি ইজিপ্ট থেকে ফিরে এসেছিল, তাদের মধ্যে তখনও জীবিত একটা শক্তিশালী ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের ওপর ভিত্তি করেই হয়েছিল। এখানে কোনো সমস্যা নেই। আমি বলেছিলাম যে, এইরকম একটা ঐতিহ্য, মাত্র দুই বা তিন প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে বাহিত হয়েছিল এবং মৌখিক যোগাযোগের সচেতন স্মৃতির মধ্যে দিয়ে রক্ষিত হয়েছিল। সেই পূর্বপুরুষগণ আলোচ্য ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলির জন্যও কি আমরা এই একই ব্যাপার বিশ্বাস করতে পারি যে– ওই ঐতিহ্য সর্বদাই একটি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিল, যে জ্ঞান সাধারণভাবেই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশধরদের মধ্যে চলে আসত? আমরা এখন আর জানিনা, কারা ছিলেন সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা এই জ্ঞান নিজেদের মধ্যে সঞ্চিত রাখতেন এবং মুখে মুখে তা সঞ্চালিত করে দিতেন। সেলিন্ এর মতে, মোজেসের হত্যার যে ঐতিহ্য তা পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবর বিদ্যমান ছিল, যতদিন না তা লিখিতভাবে সংরক্ষিত করা হয়, যার থেকেই সেলিনের পক্ষে তথ্যটি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তবুও এটা কিন্তু সকলের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না; এটা

সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল না। এই ধরনের সম্প্রচার কি তার ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট? আমরা কি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে এই কৃতিত্ব দিতে পারি যে, তারা যখন এই জ্ঞানের কথা জানতে পারলেন, তখন তারা জনগণের মানসিকতাকে তাদের ক্ষমতার দ্বারা চিরকালের জন্য উজ্জীবিত করে তুললেন? মনে হয়, এই অজ্ঞান জনগণের মানসিকতায় এই জ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ হয়ত ছিল। যা বাইরে থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

যদি আমরা আদিম যুগের অনুরূপ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ফেরাই, তাহলেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অতি দুরূহ ব্যাপার হয়ে যাবে। হাজার হাজার শতাব্দীকালে এটা নিশ্চয়ই বিস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছিল যে, আদিম যুগে একজন পিতা ছিলেন, যিনি, আমার উল্লেখ করা সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর অদৃষ্টে কী ঘটেছিল। আবার মোজেসের বেলায় যেমন হয়েছিল তেমনি মৌখিক ঐতিহ্যের কথাও এব্যাপারে ভাবা যায় না। কাজেই কোন্ অর্থে এখানে ঐতিহ্যের কথা আসে? সেটা তাহলে কোন্ রূপে, কী চেহারায় ছিল?

যে সব পাঠক জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে ঢুকতে চান্ না, তাদের জন্য শুরুতেই আমি নিম্নলিখিত তদন্তের ফলাফল পেশ করব। আমি দাবী করছি যে, এই ব্যাপারে একক এবং বহুর মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। জনগণও অতীতের একটা ছাপ তাদের অচেতন স্মৃতির দাগের মধ্যে ধরে রাখে।

একক ব্যক্তির এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। গোড়ার দিকের ঘটনাগুলির স্মৃতিচিহ্ন সে একটা বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে ধরে রাখে। একথা বলা যায় যে, সেই ব্যক্তি সবসময়েই সেটা জানত, যেমনভাবে আমরা অবদমিত বিষয়গুলো জানি। আমাদের কতগুলি ধারণা তৈরি হয়েছে– যা বিশ্লেষণ দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায়– যে, কেমন করে কিছু বিষয় মানুষ ভুলে যায় এবং কেমন করে কিছু সময় পরে তা আবার স্মৃতির আলোয় ফিরে আসে। ভুলে যাওয়া বিষয়গুলি নষ্ট হয়ে যায় না, কেবল "অবদমিত" হয়; তাদের চিহ্ন একেবারে নিজস্ব টাট্‌কা চেহারায় স্মৃতিতে থেকে যায়, কিন্তু তাদের, অচেতন থেকে চেতনে ফিরিয়ে আনার যে মানসিক প্রক্রিয়া, তার বিরোধী প্রক্রিয়ার দ্বারা পৃথক করে রাখা হয় (কাউন্টার-ক্যাথেক্সেস্)। তারা অন্য বুদ্ধিগত প্রক্রিয়াগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত করতে পারে না; তারা থাকে অচেতনে, চেতনার ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশ্য এমন হতে পারে যে, এই অবদমিত বিষয়গুলির কিছু অংশ এই প্রক্রিয়ার হাত থেকে পালিয়ে গেছে, স্মৃতির ধরাছোঁয়ার মধ্যে রয়ে গেছে, এবং কখনও কখনও চেতনায় আবির্ভূত হয়, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তারা কিন্তু সেই পৃথক রয়ে গেছে, মনের অন্য অংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা অচেনা অস্তিত্ব। এটা ঘটতে পারে, কিন্তু এটা ঘটার কোনো প্রয়োজন নেই। অবদমন একেবারে সম্পূর্ণ হতে পারে এবং এই বিষয়টিই আমি পরীক্ষা করতে চাই।

এই অবদমিত বিষয়গুলি চেতনায় ঢুকে পড়বার মতো শক্তি ধরে। যখন তিনটি শর্ত পালিত হয়, তখনই এই লক্ষ্য পূরণ হয়: (১) যখন কাউন্টার-ক্যাথেক্সেস্ এর শক্তি কোনো অসুস্থতার জন্যে কমে যায়, যেটা অহং-এর ওপর কার্যকরী হয়, অথবা অহং-এর উপর ক্যাথেক্সেস-এর অন্যরকম বন্টন হয়, যেটা ঘুমের মধ্যে নিয়মিতই ঘটে থাকে, (২) যখন অবদমিত বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, বয়:সন্ধির সময়কার প্রক্রিয়াগুলি, (৩) যখনই সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মনের ওপর ছাপ ফেলে, বা এমন কোনো অভিজ্ঞতা দেয়, যা অবদমিত বিষয়গুলির সঙ্গে এমন সাদৃশ্যযুক্ত যে সেগুলিকে জাগিয়ে তোলার শক্তি ধরে। কাজেই সাম্প্রতিক বিষয়গুলি অবদমিত বিষয়ের সুপ্ত শক্তি থেকে জোর পায় এবং অবদমিত বিষয়গুলি তখন সাম্প্রতিক বিষয়গুলির পেছনে এবং তার সাহায্য নিয়ে নিজের কার্যকারিতা প্রকাশ করে।

এই যে তিনটি শর্ত বলা হল, এর কোনটিতেই কিন্তু অবদমিত বিষয়গুলি বিনাবাধায়, বা, অপরিবর্তিত ভাবে চেতনায় পৌঁছতে সফল হয় না। কাউন্টার-ক্যাথেক্সিস্ এর বাধা সম্পূর্ণভাবে এড়াতে পারে না, তাই এগুলোয় কিন্তু সবসময়েই বিকৃতি ঘটে, অথবা সাম্প্রতিক কোনো অভিজ্ঞতার প্রভাব, অথবা দুটো সম্মিলিত কারণেও এই বিকৃতি ঘটতে পারে।

একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া চেতন অথবা অচেতন, এই দুই অবস্থার তফাৎ-কে আমি একটা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন এবং নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করেছি। অবদমিত বিষয়গুলি হচ্ছে অচেতন। এই বাক্যটিকে যদি উল্টোনো যেত, তাহলে ব্যাপারটা খুব মজাদার সরলীকরণ হত– অর্থাৎ, যদি গুণগুলির "চেতন" এবং "অচেতন"-এর তফাৎ "অহং এর অধীনস্থ" এবং "অবদমিত" এই দুই-এর তফাৎ এর সঙ্গে একরূপ হত। আমাদের মানসিক জীবনে এইরকম স্বতন্ত্র এবং অচেতন বিষয়গুলি থেকে যায়, এই সত্যটি নতুন এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে কিন্তু এগুলি অত্যন্ত জটিল। এটা সত্যি যে, সমস্ত অবদমিত বিষয়গুলি অচেতন, কিন্তু অহং-এর মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই চেতন, এটাও সত্যি নয়। আমরা বুঝতে পারি যে, চেতন হওয়াটা একটা ক্ষণজীবি গুণ যা একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অস্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে। এইজন্য, আমাদের প্রয়োজনে "চেতন"-কে আমরা "চেতন হতে সমর্থ" এই কথাগুলি দিয়ে পাল্টে নেব এবং এই গুণটিকে আমরা "পূর্বচেতনা" বলব। তাহলে আমরা আরো সঠিকভাবে বলতে পারি: "অহং হচ্ছে মূলত: পূর্বচেতনা (ফলত: চেতনা-ই) কিন্তু অহং এর কিছু অংশ অচেতন।

শেষ বক্তব্যটি থেকে আমরা শিখি যে, যে গুণগুলির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা কিন্তু মানসিক জীবনের অন্ধকারে আমাদের পথ দেখানোর মতো যথেষ্ট নয়, আমাদের অন্য আরেকটা বৈশিষ্ট্য আনয়ন করতে হবে, যেটা আর গুণগত নয়। দৈশিক হবে, এবং– যেটা একটা বিশেষ মূল্য আরোপ করবে– একই সঙ্গে জীন-গত হবে। এবারে আমরা আমাদের মানসিক জীবন থেকে– যেটাকে

আমরা অনেকগুলি শ্রেণী বিন্যাস, জেলা অথবা প্রদেশ-সম্বলিত একটি যন্ত্রের বা অবয়বের মতো দেখি– একটি এলাকা যার নাম আমরা বলি "আসল অহং (ইগো), আর একটি এলাকা, যাকে আমরা বলি "ইড্," এদুটি এলাকাকে আলাদা করে দেখব। ইড্ হচ্ছে প্রাচীনতর; ইগো বহির্বিশ্বের প্রভাবের মাধ্যমে এর থেকেই বিকশিত হয়েছে, যেমন গাছের ছাল একটা গাছের চারপাশে বিকশিত হয়। আমাদের প্রাথমিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলি ইড্-এর মধ্যেই জন্মায়; ইড্-এর ভেতরে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই অচেতন। আমি যেমন বলেছি, ইগো পূর্বচেতনা-র এলাকার সঙ্গে যুক্ত; স্বভাবত:ই এর অংশ বিশেষ অচেতন থাকে। "ইড্"-এর ভেতরের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ আলাদা নিয়মে চলে; ইড্-এর ভেতরের প্রক্রিয়াগুলির গতিপথ এবং একে অপরের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তার থেকে আলাদা হচ্ছে ইগো-র ভেতরের প্রক্রিয়াগুলি। এই যে পার্থক্য, এটা আবিষ্কারের ফলেই আমরা নতুন করে বুঝতে শুরু করেছি এবং এর সমর্থনও পাচ্ছি।

অবদমিত বিষয়গুলো ইড্-এর মধ্যে আছে বলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে এবং তারা ইড্ এর কার্যপ্রণালী অনুযায়ী চলে; ইড্-এর সঙ্গে তাদের তফাৎ কেবলমাত্র তাদের উদ্ভবে। এই তফাৎ শুরুর দিকেই হয়ে থাকে। যখন ইড্ থেকে ইগোর বিকাশ ঘটছে। তারপর ইগো ইড্-এর অংশ বিশেষ নিয়ে নেয় এবং তাকে পূর্ব-চেতনার স্তরে উঠিয়ে নিয়ে আসে; অন্য অংশগুলো, কাজেই ব্যহত হয় না এবং 'ইড্'-এর মধ্যে আসল "অচেতন" হিসাবে থেকে যায়। ইগোর পরবর্তী বিকাশকালে, যদিও এর কিছু কিছু মনস্তাত্ত্বিক ছাপ এবং প্রক্রিয়া, প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় আটকে যায়; তাদের তখন আর পূর্ব-চেতন চরিত্র থাকে না, কাজেই তারা আবার নীচে চলে এসে ইড্-এর অখন্ড অংশ হয়ে যায়। এইটাই তখন 'ইড্'-এর মধ্যে থাকা "অবদমিত বিষয়"। মনের এই দুটো প্রদেশের মধ্যে যাতায়াতের এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে, একদিকে যেমন 'ইড্'-এর মধ্যেকার অচেতন প্রক্রিয়াকে পূর্ব-চেতন স্তরে তুলে আনা যায় এবং ইগো-র মধ্যে প্রবেশ করানো যায়, অন্যদিকে তেমনি, ইগো-র মধ্যেকার পূর্ব-চেতন বিষয় উল্টোমুখে ভ্রমণ করতে পারে এবং ইড্-এর মধ্যে চলে আসতে পারে। পরবর্তীতে, ইগোর সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেকটি জেলা, "সুপার ইগো," বেরিয়ে আসে, যদিও এই পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়।

এই সমস্ত কথা খুব সরল বলে মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি মন নামক যন্ত্রটির অপরিচিত অংশগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে আর কঠিন মনে হবে না। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, যে মনস্তাত্ত্বিক বিভাগগুলি আমি এখানে তৈরি করেছি, তার সঙ্গে সাধারণভাবে মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই; কেবলমাত্র একটা ব্যাপারেই এটা মগজে খোঁচা মারে। এই যে কল্পনা বা বোধ, যেটা আমি যে

কোনো অন্যলোকের মতোই পরিষ্কার বুঝতে পারি, সেটা যে অসন্তোষজনক, তার মূল শেকড় প্রোথিত আছে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির গতিশীলতা সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে। আমরা বুঝি যে, একটা চেতন ধারণা, পূর্ব-চেতন ধারণা থেকে, এবং সেটা আবার অচেতন ধারণা থেকে পৃথক বলে গণ্য হওয়াটা মনস্তাত্ত্বিক শক্তির একটা রূপান্তর, অথবা হয়ত, আরেকরকম বন্টন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ক্যাথেক্সেস্ এবং হাইপারক্যাথেক্সেস্-এর কথা বলি, কিন্তু তারও পরে একটা কার্যকরী মতবাদ গঠনের জন্যে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই, বা শুরুও করতে পারি না। চেতনা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমরা অন্তত বলতে পারি যে, এটা আদতে উপলব্ধির ব্যাপার। যাবতীয় উপলব্ধি, তা সে যন্ত্রণা-সঞ্জাত, স্পর্শানুভূতি-সঞ্জাত, শ্রবণ-সঞ্জাত অথবা চাক্ষুস উদ্দীপনা-জাত হোক, সেগুলি সব চেতন হওয়াই সম্ভব। ইড্-এর মধ্যেকার চিন্তা-প্রক্রিয়া এবং তার অনুরূপ যা কিছু, সে সব এমনিতেই অচেতন এবং তারা বাক্‌শক্তির মাধ্যমে, স্পর্শ এবং শ্রবণ-সঞ্জাত উপলব্ধির স্মৃতির কণার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। পশুদের ক্ষেত্রে, যাদের বাক্-শক্তি নেই, এই সম্বন্ধগুলি নিশ্চয়ই আরো সরল হবে।

একেবারে গোড়ার দিকের মানসিক আঘাতের ছাপ, যা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, হয় পূর্বচেতনে পরিবাহিত হয়নি, অথবা খুব তাড়াতাড়িই অবদমনের মাধ্যমে ইড্-এর মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করেছে। তাদের স্মৃতির ভগ্নাংশ তখন অচেতন এবং ইড্ থেকেই কাজ করতে থাকে। আমাদের বিশ্বাস, যতক্ষণ সেগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, ততক্ষণ আমরা তাদের পরবর্তী অবস্থাকে পরিষ্কার অনুসরণ করতে পারব। কিন্তু যখন আমরা সচেতন হই যে, একটি ব্যক্তির মানসিক জীবনে, হয়ত যে অভিজ্ঞতা সে নিজে লাভ করেছে শুধু তাই নয়, জন্ম সূত্রে সে যা নিয়ে এসেছে, তার জাতিগত জেনেটিক উৎসের ভগ্নাংশ, একটি সুপ্রাচীন উত্তরাধিকার, সে সবও তার মধ্যে রয়েছে। এরপরই প্রশ্ন ওঠে : এই যে উত্তরাধিকার, এটা কী দিয়ে গঠিত, এর ভেতরে কী আছে এবং এর প্রমাণ আছে কি?

প্রথম এবং নিশ্চিত জবাব হচ্ছে যে, এর ভেতরে কতগুলি বিন্যাস বা ব্যবস্থা আছে, যা সমস্ত জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই আছে; অর্থাৎ কিনা, বিকাশের কোনো একটি ধারাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং কোনো কোনো উত্তেজনায়, প্রভাবে এবং উদ্দীপনায় বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করা। যেহেতু অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, এই ব্যাপারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য থাকে, তাই আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারে এই পার্থক্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করা থাকে; এইগুলো একজন ব্যক্তির গঠনগত উপাদানগুলোকে বোঝায়। যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, অন্তত: তার শিশুবয়সের বছরগুলোয় তারাও একইরকম প্রতিক্রিয়া করে এবং সেইজন্যেই কিছু সংশয় উঠে আসে যে,

এই প্রতিক্রিয়াগুলো, তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত পার্থক্য সহ, সেই প্রাচীন উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে গণ্য হবে কিনা। এই সংশয়কে কিন্তু বাতিল করতে হবে; এই সাদৃশ্যের ঘটনা প্রাচীন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে না।

ইতিমধ্যে বৈশ্লেষিক গবেষণায় বেশ কিছু ফলাফল জানা গেছে, যাতে আমাদের চিন্তার খোরাক আছে। প্রথমত: হচ্ছে কথাবার্তার প্রতীকিবাদের বিশ্বজনীনতা। একটা বস্তুর মধ্যে দিয়ে আরেকটা বস্তুর প্রতীকি প্রতিস্থাপন-ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য– আমাদের সন্তানরা এব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত এবং মনে হয়, ওদের কাছে এটা খুব স্বাভাবিক। ওরা কীভাবে এটা শিখল, সেটা আমরা খুঁজে বের করতে পারি না, এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, অনেক ক্ষেত্রে এটা শেখা অসম্ভব। এটা হচ্ছে আদি জ্ঞান, যেটা বয়স্করা পরে ভুলে যায়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, সেগুলি তাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রতীক রূপে আসে, কিন্তু যতক্ষণ না বিশ্লেষক এগুলোর ব্যাখ্যা করে দেন, ততক্ষণ তারা সেগুলো বুঝতেই পারে না। এবং তার পরেও, তারা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্বাস করতে চায় না। যখন কেউ কোনো প্রচলিত শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করে, যার মধ্যে এই প্রতীকিবাদ দানা বেঁধে গেছে, তখনও তাকে স্বীকার করতেই হয় যে, বাক্যটির আসল অর্থ তার বোধগম্য নয়। প্রতীকিবাদ এমনকি ভাষার পার্থক্যকেও অস্বীকার করে; তদন্ত করলে বোঝা যাবে যে, এটা সর্বব্যাপী, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এক। এখন মনে হচ্ছে, এটা বোধ হয়, যখন থেকে বাক্‌শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে, তখন থেকেই প্রাচীন উত্তরাধিকারের একটা প্রমাণিত বিষয়, যদিও আরেকটা ব্যাখ্যার চেষ্টাও করা যেতে পারে : বলতে পারা যায় যে, এগুলি হচ্ছে, ধারণাগুলির মধ্যে চিন্তার যোগাযোগ, যেগুলি বাক্‌শক্তির ঐতিহাসিক বিকাশের সময়ই গঠিত হয়েছিল এবং যেগুলির, যখনই কোনো ব্যক্তি এইরকম একটা বিকাশের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়, তখনই প্রতিবারই, পুনরাবৃত্তি ঘটে। এটাই তাহলে একটা চিন্তার বিন্যাসের উত্তরাধিকার– যেমন অন্যত্র, সহজাত প্রবৃত্তির বিন্যাসের উত্তরাধিকার ঘটে; সুতরাং, এর থেকেও আমাদের সমস্যার সমাধানে নতুন কিছুই পাওয়া যাবে না।

বৈশ্লেষিক গবেষণায় অবশ্য এমন অনেক জিনিস পাওয়া গেছে, যা আমাদের এ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়গুলির থেকে গুরুত্বে অনেক বেশি। একেবারে গোড়ার দিকের মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াগুলিকে পরীক্ষা করে আমরা অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে, সেগুলি সঠিকভাবে এতে প্রতিফলিত হচ্ছে না, বরং তার থেকে এমন একটা দিকে সরে যাচ্ছে, যেটা জেনেটিক ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় এবং এই রকম প্রভাবের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত কোনো শিশু যখন ঈডিপাস ও পুরুষত্ব-হীনতা ভীতির কম্‌প্লেক্স বা মানসিক জটিলতায় ভোগে, তার তখনকার

পিতামাতার প্রতি ব্যবহারে এই রকম প্রতিক্রিয়া খুব বেশি মাত্রায় থাকে, যেটা সেই ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হয় এবং কেবলমাত্র পূর্বেকার প্রজন্মগুলির অভিজ্ঞতার নিরিখে, জাতিগত জেনেটিক বিচার দ্বারাই বোঝা যায়। আমি জোর করে বলতে চাই যে, মানুষের প্রাচীন উত্তরাধিকারের মধ্যে কেবল বিন্যাসগুলিই নয়, ধারণা-সঞ্জাত বিষয়গুলো, এবং আগের প্রজন্মের অভিজ্ঞতার স্মৃতির ভগ্নাংশও অন্তর্ভূক্ত। এইভাবে, প্রাচীন উত্তরাধিকারীত্বের বিস্তার এবং গুরুত্ব লক্ষণীয়ভাবে বর্ধিত হবে।

স্বীকার করতেই হবে যে, আমি এমনভাবে যুক্তি সাজিয়েছি যেন স্মৃতির উত্তরাধিকার আছে, যার কিছু কিছু আমাদের পূর্বপুরুষরাও জানতে পেরেছিলেন, সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই এবং শিক্ষার প্রভাবে– এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। যখন আমি কোনো জাতির মধ্যে এখনও জীবিত কোনো প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বলি, একটা জাতীয় চরিত্র গঠনের কথা বলি, তখন কিন্তু আমি, একটা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের, কোনো মুখে মুখে বাহিত কথা নয়, কথা ভেবেই এসব কথা বলি। অথবা বলা যায়, আমি এই দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ করিনা, এবং এটাও খুব স্পষ্ট নয় যে, আমি এই পার্থক্যটাকে অবহেলা করে কী সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছি। একথা সত্যি যে, প্রাণীবিজ্ঞানের বর্তমান মনোভাব, যেটা, অর্জিত গুণ বংশধরদের মধ্যে বাহিত হয় এই ধারণাকে বাতিল করে দেয়, সেটা এই বিষয়টাকে আরো কঠিন করে তোলে। বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এ সত্ত্বেও, আমি, প্রাণীবিজ্ঞানের বিকাশ এই বিষয়টিকে গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে যাবে, এটা ভাবতেই পারি না। একথা সত্যি যে, দুটো বিষয় একই রকম নয়; প্রথমটির ক্ষেত্রে, এটা একটা অর্জিত গুণগুলির প্রশ্ন, যেটা বোঝা বেশ কঠিন; অপরটির ক্ষেত্রে, বাহ্যিক প্রকাশের স্মৃতির ভগ্নাংশ, যেটা প্রায় বাস্তব। হয়ত, আমরা একটাকে আরেকটা ছাড়া ভাবতে পারি না। যদি আমরা আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারে এইরকম স্মৃতির ভগ্নাংশের অবিরাম অস্তিত্বের ব্যাপারটা মেনে নিই, তাহলেই আমরা ব্যক্তিগত এবং জনগণের মনস্তত্ত্বের মাঝখানের ফাঁকটায় সেতুবন্ধন করতে পারি এবং যেমন ভাবে আমরা একটি একক স্নায়বিক পীড়াগ্রস্তের চিকিৎসা করি, সেইভাবে পুরোজাতির চিকিৎসা করতে পারব। যদিও আমরা স্বীকার করব যে, আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারত্বে স্মৃতির টুকরোগুলির জন্য আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত, বিশ্লেষক ক্রিয়ায় বের করে আনা স্মৃতির অবশিষ্টাংশ ছাড়া আর কোনো জোরালো প্রমাণ নেই, যা জাতির জেনেসিস থেকে অন্য দিকে সরে যেতে চায়, তবুও ব্যাপারটা মেনে নেওয়ার জন্যে প্রমাণটাকে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়

এই স্বীকৃতির পর আমরা অন্য কিছু করব। প্রাচীনকালে মানুষের ঔদ্ধত্য মানুষ ও পশুর মাঝখানে যে বিশাল ফাঁক সৃষ্টি করেছিল, সেটা আমরা কমাবো। যদি প্রাণীদের তথাকথিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলো– যেগুলো প্রথম থেকেই তাদের নতুন পরিস্থিতিতে বসবাসের জন্যে এমন ভাবে ব্যবহার করায় যেন তারা

পুরোনো এবং দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত বাসস্থানেই আছে, যদি প্রাণীদের এই সহজাত জীবনের জন্য কোনো ব্যাখ্যা আনা যায়, সেটা তাহলে এইরকম হবে: যে, তারা তাদের নতুন অস্তিত্বের মধ্যে তাদের জাতির অভিজ্ঞতাকে বহন করে নিয়ে আসে; অর্থাৎ তারা তাদের মনের মধ্যে, তাদের পূর্বপুরুষরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তার স্মৃতি সংরক্ষিত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যেও এই প্রাণীজগতের ব্যাপারগুলো মূলত: অন্যরকম হতে পারে না। মানুষের নিজের প্রাচীন উত্তরাধিকার, যদিও বিষয়-গত ও চরিত্র-গতভাবে আলাদা, প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খায়।

এত সব বিবেচনা করবার পর, আমার আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, মানুষ বরাবরই জানত– এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় যে, একদা তাদের একজন আদিম পিতা ছিলেন এবং তারা তাঁকে মেরে ফেলেছিল।

এখানে আরো দুটো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। প্রথমত:, কোন্ পরিস্থিতিতে এই রকম স্মৃতি প্রাচীন উত্তরাধিকারে প্রবেশ করে; এবং দ্বিতীয়ত:, কোন্ পরিস্থিতিতে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে– অর্থাৎ ইড্-এর মধ্যেকার অচেতন অবস্থা থেকে সচেতনে ঢুকে পড়ে, যদিও একটা পরিবর্তিত এবং বিকৃত চেহারায়? প্রথম প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়: এটা ঘটে, যখন অভিজ্ঞতাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, অথবা প্রায়ই পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, অথবা এই উভয় ক্ষেত্রেই। পিতৃ-হত্যায়, দুটো শর্তই পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে আমি বলব: অনেকগুলো প্রভাব থাকতে পারে, যেগুলো সব জানার প্রয়োজন নেই; কোনো কোনো মানসিক আঘাতের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তার অনুরূপ একটা স্বত:স্ফূর্ত পথও থাকা সম্ভব। ঘটনাটির কোনো সাম্প্রতিক বাস্তব পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে স্মৃতির টুকরোগুলোর সজীব হওয়াটা নিশ্চয়ই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোজেসের হত্যা সেইরকমই একটা পুনরাবৃত্তি এবং পরবর্তীকালে, যিশুখ্রিস্টের তথাকথিত বিচারের পর হত্যাও, যাতে এই ঘটনাগুলো কার্যকরী প্রতিনিধি হিসাবে সামনে চলে আসে। মনে হয়, একেশ্বরবাদের উৎপত্তি এই সমস্ত ঘটনা ছাড়া সম্ভবপর হত না। আমাদের মনে পড়ে যায় কবির এই কথাগুলো :

> অন্তহীন গানের ভেতর যা কিছু থাকবে বেঁচে
> আগে তাকে জীবনেই ডুবে মরতে হবে যেচে।

একটা মন্তব্য দিয়ে শেষ করব, যেটায় একটা মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র মৌখিক যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল কোনো ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কোনো আসক্ত চরিত্র তৈরি করতে পারে ন। এটা শুনতে হবে, ওজন করতে হবে এবং হয়ত বাতিল করতে হবে, যেমন বাইরের অন্যান্য খবরের ক্ষেত্রে হয়; যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার যে জবরদস্ত বাঁধন, তার থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার এ কখনোই পাবে না। ফিরে এসে এ রকম প্রবল কার্যফল দেখানোর আগে, একে

প্রথমে অবদমিত হতে হবে, অর্থাৎ অচেতনের অবস্থায় আসতে হবে, তারপর জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ হতে বাধ্য করবে, যেমন আমরা দেখেছি– অবাক হয়ে এবং এখনও পর্যন্ত, না বুঝে– ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে। এবং এটাই একটা বিবেচনার বিষয়, যা একটি বিশ্বাসের অনুকূলে পাল্লা ভারী করবে, যে বিশ্বাস বলে যে, আমি যেমন ভাবে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি, তেমনভাবেই ঘটনাগুলো সত্যিই ঘটেছিল– অথবা তার কাছাকাছি।

২য় পরিচ্ছেদ

১. সারাংশ

এই নিবন্ধের নিম্নোক্ত অংশ দীর্ঘ ব্যাখ্যা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতীত পৃথিবীর সামনে আনা যাবে না। কারণ এটা প্রথম অংশের একটা বিশ্বস্ত, আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু কিছু কিছু জটিল তদন্তকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং ইহুদি জাতির চরিত্র এখন যেমন, সেভাবে কেমন করে এবং কেন বিকশিত হল সেই সমস্যাকে নির্দেশ করে, কিছু আরো যোগ করা হয়েছে। আমি জানি যে, এইভাবে আমার বিষয়টিকে পেশ করা যেমন অফলপ্রসূ, তেমনই অশিল্পীজনক। আমি নিজেও এটা কোনোভাবেই অনুমোদন করি না। তাহলে আমি এটা কেন এড়িয়ে যাইনি? প্রশ্নের উত্তর সোজা, কিন্তু স্বীকার করা কঠিন। এই বইটা যে অস্বাভাবিক ভাবে লেখা হয়েছিল, তার চিহ্ন আমি মুছে ফেলতে পারছিনা।

সত্যি কথা বলতে গেলে, এই বইটা দু'বার লেখা হয়েছে। প্রথমবার, কয়েক বছর আগে, ভিয়েনাতে, যেখানে এটা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনায় আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি বইটা সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আমাকে একটা ভূতের মতো দিনরাত তাড়া করে বেড়াত, এবং তাই আমি নিজের সঙ্গে একটা আপস করে বইটার দুটো অংশ স্বাধীনভাবে ইমাগো পত্রিকায় প্রকাশ করলাম। সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ বইটার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সূত্রপাত: "মোজেস একজন ইজিপশিয়ান" এবং তার পর নির্মাণ করা ঐতিহাসিক নিবন্ধ, "যদি মোজেস একজন ইজিপশিয়ান হতেন"। বাকিটা, যেটা মানুষকে আঘাত করতে পারত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল– অর্থাৎ একেশ্বরবাদের উৎপত্তির ওপরে আমার মতবাদের প্রয়োগ এবং আমার ধর্মকে ব্যাখ্যা করা– এগুলো আমি সরিয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, চিরকালের জন্য। তারপর মার্চ ১৯৩৮-এ অপ্রত্যাশিত জার্মান আক্রমণ এসে পড়ল। আমাকে ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করল,

কিন্তু সাথে সাথে আমাকেও একটা ভয় থেকে মুক্ত করল যে, আমি বইটা প্রকাশ করলে, হয়ত সেই দেশে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ হয়ে যেত, যেখানে সেটার চর্চা তখনও চালু ছিল। ইংল্যান্ড পৌঁছেই আমার এতদিনকার রুদ্ধজ্ঞানকে জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করার লোভ সামলানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠল এবং তাই আমি আমার নিবন্ধের তৃতীয় অংশটা পুনরায় লেখা শুরু করলাম, যাতে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত প্রথম দুটি অংশের পেছন পেছন এটাকেও প্রকাশ করতে পারি। স্বভাবতই সংগৃহীত তথ্যগুলোকে নতুন করে সাজানো প্রয়োজন হল, যদিও অংশতঃ। কিন্তু এই দ্বিতীয় দফার সম্পাদনায় সমস্ত তথ্যগুলো মেলাতে সক্ষম হলাম না। আবার অন্যদিকে মনস্থির করতে পারছিলাম না, আগের দুটো লেখাকে বাদ দেব কিনা, এবং তখনই দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে প্রথম সংস্করণটা পুরোটা নির্ভেজাল যোগ করার একটা মীমাংসা বের করলাম, যদিও তাতে অতিরিক্ত পুনরুক্তির অসুবিধাটা রয়ে গেল।

২. ইস্‌রায়েলের লোকেরা

আমরা জানি যে, ভূমধ্যসাগরের অববাহিকায় প্রাচীনকালে যতগুলো জাতি বাস করত, তাদের মধ্যে ইহুদি জাতিটাই বোধ হয় একমাত্র জাতি, যাদের এখনও একই নামে অস্তিত্ব আছে এবং তাদের স্বভাব চরিত্রও বোধ হয় একইরকম আছে। অভূতপূর্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে এই জাতি তাদের দুর্ভাগ্য এবং যাবতীয় অত্যাচারকে প্রতিহত করেছে, বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছে এবং ফলতঃ অন্য জাতিদের বিরাগভাজন হয়েছে। কোথা থেকে ইহুদিদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা এল এবং কেমন করে তাদের চরিত্র তাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল, সেটা ভালো করে বোঝা দরকার।

আমরা ইহুদি চরিত্রের একটা বিশিষ্টতা নিয়ে শুরু করব, যেটা অন্য লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এরা নিজেদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে, নিজেদের মহান ভাবে, উচ্চ স্তরের মানুষ ভাবে, অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, যাদের থেকে এরা নিজেদের নানান্ প্রথার দ্বারা স্বতন্ত্র মনে করে। সেইজন্যে এরা জীবনে একটা বিশেষ বিশ্বাস দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে থাকে, যেন তারা কোনো অমূল্য উপহারের গোপন অধিকারী; এটা একধরনের আশাবাদ। ধার্মিক ব্যক্তি একে বলবে ঈশ্বরে বিশ্বাস। ওদের এই ধরনের আচরণের কারণ এবং ওদের অমূল্য ধন কী, তা আমরা জানি। ওরা সত্যিই বিশ্বাস করে যে, ওরাই ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি; ওরা নিজেদের ঈশ্বরের খুব কাছের লোক বলে মনে করে, এবং এই জন্যেই ওরা গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বাস্য বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওরা এখনও যেমন ব্যবহার করে, গ্রিক সংস্কৃতির সময়েও একইরকম ব্যবহার করত। ইহুদি চরিত্র সুতরাং এখন যা, আগেও তাই ছিল এবং গ্রিক্‌রা, যাদের মধ্যে এবং যাদের পাশাপাশি ওরা বাস করত, ইহুদিদের এই চারিত্রিক

বিশিষ্টতার বিরুদ্ধে তেমনই প্রতিক্রিয়া করত, যেমন বর্তমানে তাদের "হোস্ট"-রা করে থাকে। কেউ ভাবতে পারে যে, গ্রিক্‌রাও হয়ত, ইহুদিরা যে নিজেদের অগ্রাধিকার দাবী করে, তাতে বিশ্বাস করত! যদি কোনো একজনকে ভয়ঙ্কর পিতার প্রিয়পাত্র বলে ঘোষিত করা হয়, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই যে, অন্যান্য ভাই-বোনেরা ঈর্ষান্বিত হবে। এই ঈর্ষা কী রূপ ধারণ করতে পারে, তা যোশেফ ও তার ভাইদের যে ইহুদি কাহিনী আছে, তাতে চমৎকারভাবে দেখানো আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে পরবর্তীকালেও ইহুদিদের এই ঔদ্ধত্য যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে, কেননা পরবর্তীকালে ঈশ্বর যখন মানুষের মধ্যে একজন ত্রাতা ও রক্ষাকর্তা পাঠাতে সম্মত হলেন, তখন তিনি পুনরায় ইহুদি জাতির মধ্যে থেকেই তাঁকে নির্বাচিত করলেন। অন্য জাতিদের তখন বলার কারণ থাকতেই পারে যে, 'সত্যিই, ওরা তো সঠিক বলেছিল, ওরা ঈশ্বরের সত্যিকারের নির্বাচিত জাতি।' অথচ পরিবর্তে এই হল যে, যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়াটা ইহুদিদের ওপরে আরো ঘৃণা নিয়ে এল, ইহুদিরা নির্বাচিত জাতি হিসাবে এই দ্বিতীয়বার প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো সুবিধা আদায় করতে পারল না, কারণ তারা মুক্তিদাতাকে চিনতেই পারেনি বা স্বীকৃতিই দেয়নি।

আমার পূর্বেকার মন্তব্যের জোরে একথা বলতেই পারা যায় যে, মোজেসই ইহুদি জাতিকে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন, যেটা ওদের কাছে চিরকালের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি ওদের বলেছিলেন যে, ওরাই ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি এবং তার দ্বারা ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি ওদের পবিত্র জাতি বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ওদের বলেছিলেন, অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে থাকা ওদের কর্তব্য : অবশ্য এ নয় যে, অন্য জাতিদেরও আত্মবিশ্বাস ছিল না। এখন যেমন, তখনও তেমনি, প্রত্যেক জাতিই নিজেদের অন্য জাতির লোকেদের চাইতে উচ্চতর বলে মনে করত। ইহুদিদের আত্মবিশ্বাস অবশ্য মোজেসের মাধ্যমে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওটা ওদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল : তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের জাঁকজমকের খানিকটা নিয়ে নিয়েছিল। এবং যেহেতু আমরা জানি যে, যে ঈশ্বর ইহুদিদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদের ইজিপ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁর পেছনে ছিলেন মোজেস, যিনি এই কাজটি করেছিলেন ঈশ্বরের আদেশে। আমি সাহস করে একথা বলতে পারি: একজনই লোক, মোজেস, ইহুদি জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই জাতি, তাদের নাছোড়বান্দার মতো বেঁচে থাকার জন্য মোজেসের কাছে ঋণী; আর যত শত্রুতার, বিরোধিতার এরা মুখোমুখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তার জন্যেও এরা মোজেসের কাছেই ঋণী।

৩. মহান ব্যক্তি

এটা কেমন করে সম্ভব যে মাত্র একজন লোক এইরকম অসাধারণ কাণ্ড ঘটাতে পারেন, উদাসীন ব্যক্তি ও পরিবার থেকে একটি জাতি সৃষ্টি করতে পারেন, সেই

জাতিকে একটা নির্দিষ্ট চরিত্র দিতে পারেন এবং অনাগত সহস্র সহস্র বছরের জন্যে তাদের ভাগ্যও নির্ধারিত করে দিতে পারেন? যখন ইতিহাস কিছু কিছু ব্যক্তির– সার্বভৌম রাজা বা বিজেতাদের– তারিখ এবং জীবনেতিহাস বর্ণনা করে করে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছে, সেই সময় এই ধরনের চিন্তাভাবনা যা পৌরাণিক কাহিনী এবং বীর-পূজার সৃষ্টি করে, সেটা কি পিছনে হাঁটা নয়? আধুনিক যুগের প্রবণতা হচ্ছে, মানুষের ইতিহাসের ঘটনা-বহুলতা থেকে বেশি গোপনীয়, সাধারণ এবং নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে খুঁজে বের করা– অর্থনৈতিক প্রভাব, খাদ্য-বস্টনে পরিবর্তন, যন্ত্রব্যবহারে উন্নতি ও প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দেশান্তরে গমন ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারে, ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না, কেবল জনগণের প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া, যার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে এবং সেই প্রকাশ আবার যেন ভাগ্যক্রমে, সেই ব্যক্তির মধ্যেই ঘটে যায়।

এগুলি সম্পূর্ণ বৈধ দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু এরা, আমাদের চিন্তা-প্রক্রিয়া এবং পৃথিবীর সংগঠনের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার একটি করে প্রতিপাদক কারণ থাকে, তখনই আমাদের কার্য-কারণের সম্বন্ধ খোঁজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা মেটে। বাস্তবে কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনারই একাধিক কারণ থাকে। ঘটনার এই অগুনতি জটিলতায় আশঙ্কিত হয়ে, একটা ঘটনা-শৃঙ্খলার অংশবিশেষ, আরেকটি ঘটনা-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে গ্রহণ করে গবেষণা চলতে থাকে, কিছু অস্তিত্বহীন বৈষম্যের কথা ভাবে এবং বোধগম্য সম্পর্কগুলিকে ভেঙে-চুরে এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কাজেই, যদি কোনো একটি বিশেষ সমস্যার তদন্ত করে দেখা যায় যে, একটি একক ব্যক্তির অসামান্য প্রভাব রয়েছে, তাহলে আমাদের বিবেক অন্তত: আমাদের তিরস্কার করবেনা যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমরা সাধারণ নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে যে মতবাদ রয়েছে, তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছি। সন্দেহ নেই, বাস্তবে দুটি ব্যাপারই ঘটতে পারে। একেশ্বরবাদের উদ্ভবের জন্য, আমরা আগে যা বলেছি, তার বাইরে অন্য কোনো বাহ্যিক কারণের কথা বলতে পারি না : অর্থাৎ এই বিকাশটি ঘটেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং একটি মহান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য।

সুতরাং, কারণ নির্ণয় করার যে শৃঙ্খল বা তথ্যজাল, তার মধ্যে "মহান ব্যক্তি"-র জন্য আমরা একটা জায়গা রাখব। ওঁকে এই সম্মান দিচ্ছি কেন, এ প্রশ্ন করা যেতেই পারে। তবে অবাক হবার কিছু নেই যে, এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুব সোজা নয়। আমরা যে সব মানবিক গুণকে অত্যন্ত উচ্চাসন দিই, সেই রকম গুণ-বিভূষিত মানুষকে 'মহান' সংজ্ঞা দেওয়ার প্রাথমিক সূত্রগুলি সবদিক থেকেই অযোগ্য। সৌন্দর্য এবং পেশীবল, যতই অন্যের ঈর্ষা উদ্রেক করুক না কেন, 'মহানতা'-র দাবী করতে পারে না। কিছু মানসিক গুণও থাকা উচিত, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ

সমেত। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে: কোনো ব্যক্তির যদি একটি বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান থাকে, তাকে কোনো কারণেই মহান ব্যক্তি বলা যাবে না। একজন দাবা চ্যাম্পিয়নকে, বা একজন উচ্চস্তরের দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীকে, একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে বা বৈজ্ঞানিককেও এই আখ্যা দেওয়া যাবে না। এসব ক্ষেত্রে আমরা বড় জোর বলতে পারি, উনি একজন মহান লেখক, শিল্পী, গণিতজ্ঞ বা পদার্থবিদ, এই বিষয়ে বা ওই বিষয়ে পথিকৃৎ, কিন্তু কখনোই তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি বলতে পারব না। যেমন যখন আমরা বলি, গ্যেটে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং বিঠোভেন, এঁরা মহান ব্যক্তি, তখন তাঁদের সব মহৎ সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বাইরে আরো কিছু থাকে, যা আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে এই কথা বলতে বাধ্য করে। তা যদি না হত, তাহলে যে কোনো কাজের লোককে, যেমন বড় বড় বিজেতা, সেনাপতি, শাসনকর্তা– এদেরও, তাদের কাজের এবং প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মহান বলা যেতে পারত। যদিও এটা মোটেই সন্তোষজনক হত না এবং আমরা যে সমস্ত অপদার্থ ব্যক্তিকে নিন্দা করি, যদিও তারা নিজেদের সময়ে এবং পরবর্তী সময়েও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই নিন্দাবাদের পরিপন্থী হত। আবার সফলতাও মহান ব্যক্তি হবার জন্য কোনো বিশিষ্ট গুণ নয়। কত মহান ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা সফল হবার পরিবর্তে দুর্ভাগ্য বশতঃ শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

কাজেই, "একজন মহান ব্যক্তি"-র সংজ্ঞা খোঁজায় কোনো লাভ নেই। এটা একটা ঢিলাঢালা কথা, বিশেষ চিন্তাভাবনা না করেই কোনো বিশেষ মানবিক গুণের অসাধারণ বিকাশ কারো মধ্যে ঘটলেই বলা হয়ে থাকে; আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোনো মহান ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র আমাদের আগ্রহ জাগায় না, তাঁর যে গুণাবলী তাঁর সমকালীনদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেগুলিই আমাদের আগ্রহের বিষয়। আমি এই বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান দীর্ঘ করবনা। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য থেকে সরে যাওয়ার বিপদ আছে।

অতএব আমরা বলব যে, একজন মহান ব্যক্তি তাঁর সমকালীনদের দু'ভাবে প্রভাবিত করেন: তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে এবং তাঁর মতবাদ দিয়ে, যার ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এই মতবাদ জনগণের পুরোনো ইচ্ছাগুলোকে জাগ্রত করতে পারে, অথবা তাদের ইচ্ছাগুলোর একটা নতুন উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, অথবা জনগণকে অন্যভাবে প্রলুব্ধ করতে পারে। কখনও বা, এবং সেটা নিশ্চয়ই বেশি আদিম ফলাফল– শুধু ব্যক্তিত্বই তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তাঁর মতবাদ গৌণ হয়ে যায়। কেন যে এই মহান ব্যক্তি এত গুরুত্ব পাবার মতো উচ্চতায় উঠে যান, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। আমরা জানি যে, অধিকাংশ লোকেরাই কিছু কর্তৃত্বের অধীনে থাকার প্রয়োজন বোধ করে, যাকে তারা সমীহ করতে পারে, এবং যা তাদের উপর শুধু কর্তৃত্বই করে না, কখনও কখনও দুর্ব্যবহারও করে। আমরা একটি একক ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব থেকে শিখে গেছি, জনগণের প্রয়োজনটা কোথা থেকে উদ্ভূত হয়। এটা হচ্ছে, পিতার জন্য আকুল আকাঙ্খা, যা

আমাদের সকলের মধ্যেই শিশুকাল থেকে আছে, সেই একই পিতা, যাকে কাহিনীর নায়কেরা পরাভূত করেছে বলে গর্ব করে। এবং এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, যে সমস্ত গুণাবলী দিয়ে আমরা মহান ব্যক্তিকে ভূষিত করি, সেগুলি সবই পিতার বিশেষত্ব, যে, এই সাদৃশ্য গুলির মধ্যেই মহান ব্যক্তির নির্যাসটি লুকিয়ে আছে, যা আমরা এখনও পর্যন্ত ধরতে পারিনি। তার চিন্তাভাবনার দৃঢ়সংকল্পতা, ইচ্ছাশক্তি, তার জোরালো ক্রিয়াকর্ম, এগুলি সবই পিতার কল্পচিত্রের মধ্যে আছে; সব কিছুর ওপরে যদিও রয়েছে মহান ব্যক্তির আত্ম-নির্ভরতা ও স্বাধীনতা, সঠিক কাজ করার পূত আত্ম-প্রত্যয়, যা কখনও নির্মম হয়ে ওঠে। তাঁকে সমীহ করতেই হবে, বিশ্বাস করতেই হবে, আবার তাকে ভয় না করে উপায় নেই– কথাটা থেকেই আমাদের সূত্র পাওয়া উচিত; শিশুকালে পিতা ছাড়া আর কে মহান ব্যক্তি হতে পারেন?

কোনো সন্দেহ নেই, মোজেসের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা প্রচণ্ড পিতার অবয়ব ও চরিত্র মূর্ত হয়েছিল, যা অসহায় ইহুদি শ্রমিকদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, তারা মোজেসের প্রিয় সন্তান। আর তাই, একটা অনন্য, শাশ্বত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বোধ তাদেরকে অভিভূত করে তুলেছিল; যে, ঈশ্বরকে পূজা করার জন্য যদি তারা বিশ্বস্ত থাকে, তাহলে তাদের ভাল-মন্দ তিনি দেখবেন। হয়ত তারা ঈশ্বরের থেকে মোজেসের মূর্তিকে আলাদা করা সহজ মনে করেনি, এবং হয়ত তাদের সহজাত প্রবৃত্তি এব্যাপারে সঠিক ছিল, কারণ মোজেস তাঁর ঈশ্বরের ওপর নিজের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিলেন, যেমন তাঁর কোপন স্বভাব এবং অপ্রশম্য মেজাজ। এবং যখন ওরা সেই মহান ব্যক্তিটিকে হত্যা করল, তখন তারা কেবলমাএ একটা দুষ্কর্মেরই পুনরাবৃত্তি করল, যেটা প্রাচীনকালে পবিত্র রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যেটা, আমরা জানি, আরো পুরোনো একটা প্রথা থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল।

একদিকে যেমন এই মহান ব্যক্তির চরিত্রটি স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, তেমনি অন্যদিকে, মনে রাখতে হবে, পিতাও একসময়ে কারো সন্তান ছিলেন। ব্যক্তি মোজেস যে মহান ধর্মীয় মতবাদের ওপর নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটা তাঁর নিজের ছিল না; তিনি তাঁর রাজা ইখনাতনের কাছ থেকে এটা নিয়েছিলেন। এবং ইখনাতন, যিনি নিঃসন্দেহে একজন ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে মহান বলে প্রমাণিত– বোধ হয় তাঁর মা-এর মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে নিকট প্রাচ্য বা দূর-প্রাচ্য থেকে কিছু তথ্য-সমৃদ্ধ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আমাদের বর্তমান যুক্তিবিচার যদি সঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে যে, একেশ্বরবাদের ধারণা একটা বুমেরাং-এর মতো তার উৎপত্তি স্থলেই ফিরে এসেছিল। একটা নতুন ধারণার উদ্ভবে একজন একক ব্যক্তির অবদান কতখানি, তা জানবার চেষ্টা করা অর্থহীন। এটা সুস্পষ্ট যে, এই ধারণার বিকাশে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাদের অবদান রেখেছিল। আবার অন্যদিকে, মোজেসের কার্য-শৃঙ্খলা থেকে সরে আসা

ঠিক নয় এবং তাঁর উত্তরাধিকারী, ইহুদি ধর্মগুরুরা যা সম্পাদন করেছিলেন, তা অবহেলা করলে ভুল করা হবে। একেশ্বরবাদ ইজিপ্টে শিকড় গাড়তে পারেনি। ইস্রায়েলেও একই ব্যর্থতা ঘটতে পারত, যখন ইস্রায়েলের লোকেরা ঝামেলা ও ভণ্ডামিতে ভরা যে ধর্ম তাদের ওপর চাপানো হয়েছিল, সেটাকে পরিত্যাগ করেছিল। যদিও ইহুদি জাতির মধ্যে থেকে বারবার নানান্ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যের গায়ে নতুন নতুন রঙ লাগিয়েছিলেন, মোজেসের সতর্কীকরণ ও দাবীগুলিকে নতুন করে প্রচার করেছিলেন এবং হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি পুনরায় না আনা পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এবং দুটো মহান সংস্কারের মাধ্যমে– ব্যাবিলোনিয়ান নির্বাসনের আগে একটা ও পরে আরেকটা– জনপ্রিয় দেবতা যাহ্ভে পরিবর্তিত হয়ে, যে ঈশ্বরের পূজা মোজেস ইহুদিদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরে পরিণত হলেন। এবং এটাই জনগণের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ, যে জনগণ ইহুদি জাতি হয়ে গড়ে উঠেছিল, যারা অনেক ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছিল, যারা মোজেইক ধর্মকে বহন করবার ও প্রচার করবার ভার নিজেদের ওপর নিয়ে নিয়েছিল, তারা বিশ্বাস করত যে তারা ঈশ্বরের নির্বাচিত এবং সেটাই তাদের পুরস্কার।

৪. আধ্যাত্মিক অগ্রগতি

একটা জাতির ওপর দীর্ঘস্থায়ী আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করতে গেলে, শুধুমাত্র এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, তোমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি। যদি তাদের এ কথা বিশ্বাস করাতে হয়, তাহলে এই আশ্বাস শুধু দিলেই হবে না, প্রমাণ করতে হবে। মোজেসের প্রবর্তিত ধর্মে অভিনিষ্ক্রমণ ছিল এই প্রমাণ; ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের নাম করে মোজেস, কখনোই এই পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দিতে ক্লান্ত হননি। ইহুদিদের পাস্ওভার ভোজ-উৎসব এই ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রচলন করা হয়েছিল, অথবা কোনো একটা পুরোনো ভোজ-পর্বের ওপর এই স্মারক আরোপ করা হয়েছিল। তবু, এটা ছিল একটা স্মারক। অভিনিষ্ক্রমণও সুদূর অস্পষ্ট অতীতের কথা। সেই সময়ে ঈশ্বরের সুনজরের চিহ্ন ছিল অত্যন্ত কম; বরং ইহুদি জাতির ভাগ্য যেন ঈশ্বরের কুনজরে ছিল। আদিম মানুষেরা, যদি তাদের ঈশ্বর তাদের যুদ্ধ জয়, সৌভাগ্য বা সুখ ইত্যাদি না দিতেন, তাহলে সেই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করত, এমনকি, শাস্তিও দিত। প্রত্যেক যুগে, রাজাদের অদৃষ্টেও ঈশ্বরের মতো এই দশা হত; রাজা এবং ঈশ্বরের প্রাচীন পরিচিতি– অর্থাৎ তাদের একই উৎস– এইভাবেই বোঝা যায়। আধুনিক যুগের মানুষও তাদের রাজাদের পরিত্যাগ করে যদি তাদের রাজ্যের যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, নিজের দেশের জমি হারাতে হয়, আর্থিক সর্বনাশ হয়। ইস্রায়েলের লোকেরা যত বেশি

তাদের ঈশ্বর তাদের অমঙ্গল করতেন, তত বেশি তাঁর প্রতি অনুরক্ত থাকত কেন– এ প্রশ্ন আপাততঃ সরিয়ে রাখা যাক।

একটু অনুসন্ধান করে দেখা যায়, মোজেস যে ধর্ম তাঁর জাতিকে প্রদান করেছিলেন, তা কি ইহুদিদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল, তারা ঈশ্বরের "নির্বাচিত" এই সচেতনতা ছিল বলে? পরবর্তী তত্ত্বটি অবশ্য সহজেই পাওয়া যায়। তাদের এই ধর্ম ইহুদিদের, তাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা চমৎকার ধারণা দিয়েছিল, বা আরো মৃদুভাবে বললে, একজন মহিমান্বিত ঈশ্বরের ধারণা দিয়েছিল। যারাই এই ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, তারাই তাঁর মহত্ত্বে অংশ নিত, বলতে গেলে, নিজেদের যেন উঁচুতে তুলে ধরত। অবিশ্বাসীদের কাছে এটা হয়ত স্পষ্ট নয়, কিন্তু একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো যেতে পারে : কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে, যেখানে একটা বিপ্লব ঘটার জন্য নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, সেখানে একজন ব্রিটিশ খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, অথচ কোনো ছোট ইউরোপিয় রাষ্ট্রের একজন নাগরিক মোটেই কোনো আত্মবিশ্বাস বোধ করবেনা। ব্রিটিশ ব্যক্তিটি জানে যে, তার মাথার একটা চুল স্পর্শ করলে তার দেশ একটা যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে দেবে এবং বিপ্লবীরাও সে কথা জানে, আর সেই ছোট রাষ্ট্রের কোনো যুদ্ধজাহাজই নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানতার জন্যে যে গর্ববোধ, তার শেকড় কিন্তু আছে একজন ব্রিটিশ প্রজার নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার অনুভবের মধ্যে। এই একই জিনিস একজন মহান ঈশ্বরের ধারণার ব্যাপারেও সত্যি এবং ঈশ্বরের মহানতার জন্যে যে গর্ব, তার সঙ্গে রয়েছে ঈশ্বরের "নির্বাচিত" হওয়ার জন্যও গর্ব।

মোজেইক ধর্মের অনুশাসনগুলির মধ্যে একটির গুরুত্ব অনেক বেশি যেটা প্রথমে ঠিক বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে, ঈশ্বরের কোনো মূর্তি বানানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা, যার মানে হচ্ছে একজন অদৃশ্য ঈশ্বরকে পূজা করায় বাধ্য করা। আমার অনুমান যে, এই ব্যাপারে মোজেস আটন ধর্মকে কঠোরতায় ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। বোধ হয় তিনি সঙ্গতিপূর্ণ হতে চেয়েছিলেন: তাঁর ঈশ্বরের কোনো নামও থাকবে না, কোনো মুখাবয়বও থাকবে না। এই নিষেধাজ্ঞা বোধহয় ভোজবাজি, অসৎ আচরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন। এই নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করলে তার প্রভাব কিন্তু গভীর। কারণ এটা একটা বিমূর্ত ধারণার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে দমন করা নির্দেশ করে; এটা ইন্দ্রিয়ের ওপর আধ্যাত্মিকতার জয়।

প্রথম দৃষ্টিতে যা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না, তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে গেলে, মানুষের সংস্কৃতির বিকাশে একই চরিত্রের অন্যান্য প্রক্রিয়ার কথা মনে করতে হবে। এগুলোর মধ্যে একদম গোড়ার দিকে এবং হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি, সেগুলিকে আমরা সেই আদিম যুগের ছায়াচ্ছন্নতায় অস্পষ্ট দেখতে পাই। আর এগুলির অবাক-করা ফলাফল দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, এসব ঘটেছিল। আমাদের শিশু সন্তানদের মধ্যে, বয়স্ক স্নায়বিক পীড়াগ্রস্তদের মধ্যে এবং সেই আদিম জাতিদের মধ্যে, আমরা সেই মানসিক ব্যাপারটা দেখতে পাই, যেটাকে

আমি বলেছি, "চিন্তার অসীমশক্তি"-র ওপর বিশ্বাস। আমরা বুঝেছি যে, এটা একটা প্রভাবের অতিশয়োক্তি, যে প্রভাব আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি– এক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা-সম্বন্ধীয়– বাইরের পৃথিবীর ওপর ক্রিয়া করে বদলে দেয়। সমস্ত জাদুবিদ্যা, বিজ্ঞানের পূর্বসূরী এই সূত্রের ওপরই স্থাপিত। সমস্ত কথার জাদু এইখানেই আছে, যেমন আছে জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষমতার দৃঢ়প্রত্যয় এবং একটি নামের উচ্চারণ। আমরা অনুমান করি যে, "চিন্তার সর্বশক্তিমত্তা," ভাষার বিকাশে মানুষ যে গর্ব বোধ করেছিল তারই প্রকাশ, যা কিনা তার চলার পথে বুদ্ধিশালী মানসিক ক্রিয়াতে অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়েছিল। তারপরে আধ্যাত্মিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল, যেখানে ধারণা, বোধ, স্মৃতি এবং সিদ্ধান্ত, এগুলো চূড়ান্ত গুরুত্ব পেল আর নিম্নশ্রেণীর মানসিক প্রক্রিয়া যেগুলো মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বোধগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হল না। মানুষ হবার পথে এগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

পরবর্তীকালের আরেকটা প্রক্রিয়া বেশ বাস্তব চেহারায় আমাদের সামনে আসে। কিছু বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রভাবে– যেটা আমরা এখানে অনুসরণ করব না এবং যেটা অংশতঃ যথেষ্ট অজানা– সমাজের মাতৃতান্ত্রিক গঠনটা পিতৃতান্ত্রিক গঠনে পরিবর্তিত হল। স্বাভাবিকভাবেই এতে তখনকার চালু আইনে একটা বিপ্লব এসে গেল। আমার মনে হয় এই বিপ্লবের একটা প্রতিধ্বনি এখনও এসকাইলাস-এর "ওরেস্টিয়া"-তে শোনা যায়। মা থেকে পিতা-তে এই সরে যাওয়া, ইন্দ্রিয়ের ওপর আধ্যাত্মিকতার জয় নির্দেশ করে– অর্থাৎ সংস্কৃতির আরো একধাপ অগ্রগতি, যেহেতু ইন্দ্রিয়-র দ্বারা মাতৃত্ব প্রমানিত হয়, যেখানে পিতৃত্ব, সিদ্ধান্ত ও সূত্রের উপর অনুমিত। চিন্তা প্রক্রিয়ার পক্ষে এই ঘোষণা, ইন্দ্রিয়-বোধের থেকে ওপরে নিয়ে যাওয়া, একটা গুরুতর পরিণাম-যুক্ত পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ধর্মের ইতিহাসের মধ্যে যেগুলোর ওপর আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল: মানুষ দেখল যে, কিছু "আধ্যাত্মিক" শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ সেই সব শক্তি, যা ইন্দ্রিয়-বোধ্য নয়, বিশেষ করে, চোখে দেখা যায় না, অথচ সন্দেহাতীত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। যদি আমরা ভাষার ওপর বিশ্বাস রাখি, বাতাসের চলাচলই আধ্যাত্মিকতার মূর্তি এনে দিয়েছে, যেহেতু আত্মা তার নামটা বায়ুর সঞ্চরণ থেকেই ধার করেছে (অ্যানিমাস, স্পিরিটাস, হিব্রু রুয়াক=ধোঁয়া)। এইভাবেই ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার মূল উপাদান হিসাবে আত্মার ধারণা তৈরি হল। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বায়ুর সঞ্চরণ লক্ষিত হল, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যা থেমে যায়; এমনকি, আজকেও আমরা একজন মুমূর্ষ লোককে বলে থাকি, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এখন মানুষের কাছে আত্মার দিগন্ত উন্মোচিত হল, আর মানুষ, তার নিজের মধ্যে যে আত্মাকে আবিষ্কার করল, তা প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে আরোপ করতে চাইল। সমস্ত পৃথিবী হয়ে উঠল প্রাণময় এবং বিজ্ঞান, অনেক পরে এসে আগেকার

পরিস্থিতিকে উল্টে দেবার জন্যে অনেক কিছু করতে থাকল এবং এখনও তার কাজ শেষ হয়নি।

মোজেইক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে, ঈশ্বরকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে উঠিয়ে দেওয়া হল: ঈশ্বরের সম্পর্কে ধারণায় আরো পরিবর্তন আনবার দরজা খুলে গেল, যা নিয়ে আমি পরে বলব। বর্তমানে, এর অন্য একটা ফল সম্পর্কে বলতে হবে। আধ্যাত্মিকতায় এতসব অগ্রগতিতে আত্ম-প্রত্যয়কে বাড়িয়ে দিল, মানুষকে গর্বিত করে তুলল, যাতে তারা ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষদের চাইতে নিজেদের উন্নততর মনে করতে লাগল। আমরা জানি যে, মোজেস ইহুদিদের ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি হবার অহঙ্কার প্রদান করেছিলেন; ঈশ্বরকে অবাস্তব করে জাতির গোপন সম্পদে একটা নতুন, মূল্যবান অবদান রাখা হল। ইহুদিরা আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাদের প্রবণতাকে জিইয়ে রেখেছিল। যে রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ওদের জুটেছিল তা ওদের একমাত্র রক্ষিত সম্পদ, তাদের লিখিত বিবরণীগুলোকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল। টাইটাস জেরুজালেমের মন্দিরটি ধ্বংস করার অব্যবহিত পরেই রব্বি জোকানন্ বেন্ সাক্কাই জাবনে-তে ধর্মগ্রন্থ "তোরা" পঠন-পাঠনের প্রথম বিদ্যালয়টি খুলবার অনুমতি চান। তখন থেকে এই পবিত্র গ্রন্থ এবং তার পঠন-পাঠনই এই হুএভঙ্গ জাতিটিকে একত্র রেখেছে।

সাধারণভাবে এইটুকুই জানা যায় এবং গ্রহণ করা যায়। আমি কেবলমাত্র এইটুকুই যোগ করতে চেয়েছিলাম যে, মোজেস-এর আরোপিত ঈশ্বরকে খোলাখুলি দৃশ্যত: পূজা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থেকেই ইহুদিদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হয়েছিল।

দু'হাজার বছর ধরে ইহুদিরা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় এই যে পক্ষপাত দেখিয়েছিল, তার ফলও হয়েছিল: এতে নির্মমতার বিরুদ্ধে এবং হিংস্রতার প্রবণতার বিরুদ্ধে বাঁধ বাঁধা হয়েছিল, যে নির্মমতা ও হিংস্রতা জাতির মধ্যে সাধারণত দেখা যায়, যখন তাদের আদর্শ হয় শারীরিক এবং খেলোয়াড়ি বিকাশ। গ্রিকরা যে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল, ইহুদিরা সেটা পারেনি। এই সংঘাতে অবশ্য তারা সংস্কৃতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা, তার অনুকূলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

৫. পরিত্যাগ বনাম চরিতার্থতা

আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগতি এবং ইন্দ্রিয়-দমন, একজন ব্যক্তির অথবা একটি জাতি-র আত্মপ্রত্যয় কীভাবে বাড়িয়ে তোলে, তা মোটেই স্পষ্ট নয়। হয়ত মূল্যবোধের একটা নির্দিষ্ট মানের কথা এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তা ব্যবহার করার কথা আগে থাকতে ভাবা হয়েছিল। ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা একজন ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের ভেতরের একটা অনুরূপ বিষয়ের কথা ভাবতে পারি, যা আমরা বুঝতে শিখেছি।

যখন "ইড্" কোনো ব্যক্তির ওপর একটা যৌন উত্তেজনামূলক বা আক্রমণাত্মক প্রকৃতির কোনো সহজাত দাবী জানায় তখন ইগো-র, যে কিনা চিন্তা-ভাবনার এবং পেশীর স্নায়বিক শক্তি-সঞ্চারক যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, সহজতম এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, একটি ক্রিয়ার দ্বারা সেই দাবীকে সন্তুষ্ট করা। প্রবৃত্তির এই সন্তুষ্টিকে ইগো কামনাতৃপ্তি হিসাবে অনুভব করে, যেমন এই প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি না হলে, নিঃসন্দেহে সেটা অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করবে। এমনও হতে পারে যে, বাইরের কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য ইগো প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিকে বর্জন করে– যেমন যখন ইগো বুঝতে পারে যে, ওই কর্মটি করলে ইগোর সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। এইরকম একটা পরিতৃপ্তিকে দূরে সরিয়ে রাখা, মানে একটা "সহজাত ত্যাগ" বাইরের প্রতিবন্ধকতার জন্য– যেটা আমরা বলে থাকি, বাস্তবতা নৈতিকতা– সেটা কখনোই আনন্দদায়ক নয়। যদি আমরা আমাদের অভ্যন্তরস্থ শক্তির স্থানান্তরনের মাধ্যমে এই সহজাত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে কমাতে না পারি, তাহলে কিন্তু এই সহজাত ত্যাগ একটা চিরস্থায়ী যন্ত্রনাদায়ক চাপ সৃষ্টি করবে। এই সহজাত ত্যাগ অবশ্য আমাদের ওপর অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে জোর করে চাপানোও হতে পারে যাকে আমরা আমাদের অন্তরের ব্যাপার বলে থাকি। ব্যক্তির বিকাশের পথে বর্হিজগতের দমনমূলক শক্তির কিছু অংশ তার ভেতরে ঢুকে যায়; ইগো-তে একটা মুল্যবোধের মান তৈরি হয়, যেটা অন্য প্রক্রিয়াগুলোকে লক্ষ করে, সমালোচনা করে এবং নিষিদ্ধ করে তাদের বিরোধিতা করে। এই নতুন সৃষ্ট মানকে আমরা সুপার-ইগো বলি। এখন থেকে, ইগো, প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার আগে, শুধু বহির্জগতের বিপদগুলি সম্পর্কেই বিবেচনা করবে না, সুপার-ইগোর আপত্তিও বিবেচনা করবে এবং তাই প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি-সাধনের পথ থেকে সরে আসার আরো বেশি যুক্তি থাকবে। যদিও বাহ্যিক কারণে সহজাত প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাটা কেবলমাত্র যন্ত্রণাদায়ক, অভ্যন্তরীণ কারণে এই পরিত্যাগ, সুপার-ইগোর দাবী মেনে, তার অন্য আরেকটা সঞ্চয়ী পরিণাম আছে। অপরিহার্য যন্ত্রনা ছাড়াও এটা ইগোয় একটা আনন্দও আনে– খানিকটা পরিবর্ত সন্তুষ্টি। ইগো উঁচুতে উঠে গেছে মনে করে; এই পরিত্যাগকে একটা অমূল্য প্রাপ্তি ভেবে গর্ব বোধ করে। সুপার ইগো হচ্ছে পিতামাতার উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি (এবং শিক্ষাদাতাও) যে, কোনো ব্যক্তির জীবনের প্রথম বছরগুলিতে তার কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করে; তার ক্রিয়াকলাপগুলিকে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বাঁচিয়ে রাখে। ইগোকে চিরকাল অধীন করে রাখে এবং তার ওপর নিয়মিত চাপ রেখে যায়। ইগো, শিশুকালের মতো, তার প্রভুর ভালোবাসা ধরে রাখতে চায়, এবং প্রভুর প্রশংসাকে একটা মুক্তি ও সন্তুষ্টি বলে মনে করে। তার তিরস্কারকে বিবেকের খোঁচা বলে মনে করে, যখন ইগো কোনো সহজাত প্রবৃত্তির সন্তুষ্টিকে পরিহার করে সুপার ইগোর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে, তখন সে আরো বেশি ভালোবাসার পুরস্কার আশা

করে। এই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতার যে সচেতনতা, সেটাই তার গর্বের বস্তু হিসাবে অনুভূত হয়। কর্তৃত্ব যে সময় পর্যন্ত সুপার-ইগো হিসাবে অভ্যন্তরস্থ হয়নি, সেই সময়ে ভালোবাসা হারানোর যে ভীতি এবং সহজাত প্রবৃত্তির যে দাবী, তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা একই থাকবে। নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির একটা অনুভব আসে যদি কেউ পিতামাতার প্রতি ভালোবাসার থেকে একটা সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হয়। কর্তৃত্বের অধিকার ইগোর একটা অংশ হয়ে ওঠার পরই কেবল এই সুন্দর অনুভূতি একটা বিশেষ নার্সিস্টিক চরিত্রের গর্ব হয়ে ওঠে।

সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করে যে পরিতোষ পাওয়া যায়, সেই ব্যাখ্যা, আমরা যে প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে চাই– যেমন আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া, যেটার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগতিও রয়েছে, সেটা বুঝতে আমাদের কেমন করে সাহায্য করবে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না। কোনো সহজাত প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করা নেই, এবং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা আরো উচু কোনো মানও নেই, যার জন্য এই আত্মত্যাগ করা হবে। দ্বিতীয় বক্তব্যটাও শীঘ্রই সন্দেহজনক মনে হবে। একথা বলা যায় যে, সেই মহান ব্যক্তিই হচ্ছেন সেই কর্তৃত্ব যার জন্যে চেষ্টাটা করা হয় এবং যেহেতু মহান ব্যক্তি একজন পিতার প্রতিকল্প বলে তিনি এটি করতে পারেন, তাই আমরা অবাক হব না, যদি তাঁকে জনগণের মনস্তত্ত্বে সুপার-ইগোর ভূমিকা দেওয়া হয়। কাজেই, ব্যক্তি মোজেসের ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি সঠিক। অন্যান্য বিষয়ে যদিও কোনো সঠিক সাদৃশ্য নেই বলেই মনে হয়। আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগতি তথাকথিত উচ্চতর বুদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়ার অনুকূলে– অর্থাৎ স্মৃতি, প্রতিফলন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিরুদ্ধে মীমাংসা করে। এর উদাহরণ হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত যে, পিতৃত্ব মাতৃত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও প্রথমটি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রমাণ করা যায়। সেইজন্যই শিশু সন্তানকে পিতার নাম নিতে হয় এবং পিতার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হতে হয়। আরেকটা উদাহরণ : আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন মহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, যদিও তিনি ঝড় এবং আত্মার মতো অদৃশ্য। একটা যৌন বা আগ্রাসী প্রবৃত্তিজাত দাবীকে বর্জন করা অবশ্য এর চেয়ে খুব অন্যরকম মনে হয়।

আধ্যাত্মিকতার অগ্রগতির অন্যান্য উদাহরণে– যেমন, পিতৃ-অধিকারের জয়ে আমরা কোনো কর্তৃত্বের দিকে নির্দেশ করতে পারি না, যা, অত্যন্ত উচ্চমানের বলে যাকে স্বীকার করা হয়, তার পরিমাপ প্রদান করে। এক্ষেত্রে এটা পিতা নিজে হতে পারে না, কারণ এটা কেবল সেই অগ্রগতি যা একজন পিতাকে কর্তার পদে উন্নীত করে। কাজেই আমরা এখন এই একটা বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছি যে, মানবজাতির বিকাশের পথে ইন্দ্রিয় জগৎ ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা বিজিত হয়, এবং মানুষ উন্নতির পথে এই ধরনের প্রতিটি পদক্ষেপ, নিজেকে গর্বিত এবং উচ্চস্তরে উন্নীত বলে মনে করে। পরে অবশ্য এমন হল যে, একটা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত আবেগঘন

বিষয়, যার নাম বিশ্বাস, সে এসে আধ্যাত্মিকতাকে জয় করল। এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত "ক্রেডো কুইয়া অ্যাবসার্ডাম" এবং যে এটা উদ্ভাবন করেছে, সে এটাকে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে মনে করে। বোধ হয় এই সব মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি সার্বজনীন, সেগুলি অন্য কিছু।

যে ধর্ম ঈশ্বরের কোনো মূর্তি গড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে শুরু হয়েছিল, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিগুলো পরিত্যাগ করার ধর্ম হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে যৌন সহবাস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল; যথেচ্ছ যৌন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। ঈশ্বরকে অবশ্য যৌনতা থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে সম্পূর্ণ নৈতিকতার আদর্শরূপে উন্নীত করা হয়েছিল। নৈতিকতার অর্থ অবশ্য ছিল সহজাত প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার ওপর নিয়ন্ত্রণ। ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন ছাড়া আর কিছু চান না, অর্থাৎ সবরকম ইন্দ্রিয়জ উত্তেজনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকা, যা আমাদের বর্তমান কালের নৈতিক মান অনুযায়ী অসৎ বলে নিন্দনীয়। এই কথাগুলি ধর্মগুরুরা অক্লান্তভাবে প্রচার করতেন। এমনকি, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার জন্য যে উপদেশ তাও এইসব নৈতিকতার দাবীর গুরুত্বের কাছে ম্লান হয়ে যেত। কাজেই, প্রবৃত্তি-দমন ধর্মের একটা লক্ষণীয় দিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও শুরুর দিকে এটা ছিল না।

এইখানে একটা বক্তব্য রাখা দরকার, যা একটা ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটাবে। যদিও এটা মনে হয় যে, প্রবৃত্তির দমন এবং এর ওপর দাঁড়িয়ে যে নীতি, সেগুলি ধর্মের মূল অপরিহার্য অঙ্গ নয়, তবুও এগুলি জীনগত ভাবে ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। টোটেমিজ্‌ম, আমাদের জানা প্রথম ধর্মের রূপ, তার ধর্মীয় প্রণালীর একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে কতকগুলি আইন ও নিষেধাজ্ঞা বহন করে, যা কেবল প্রবৃত্তি-দমন ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে আছে টোটেম এর পূজা, যার ভেতরে তাকে হত্যা করা বা তার কোনো ক্ষতি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে; অসবর্ণ বিবাহ (অর্থাৎ, গোষ্ঠীর মাতা ও ভগ্নীদের প্রতি আসক্তি দমন করা); ভ্রাতৃ-গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের সমান অধিকার প্রদান (অর্থাৎ পাশবিক বলপ্রয়োগে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসা করার অদম্য ইচ্ছার ওপর নিয়ন্ত্রণ)। এই আইনগুলোর মধ্যে আমরা একটি ন্যায়পরায়ণ ও সামাজিক প্রথার সূত্রপাত দেখতে পাই। আমাদের নজর এড়ায়নি যে, এখানে দুটো আলাদা প্রেরণা কাজ করছে। প্রথম দুটো নিষেধাজ্ঞা, নিহত পিতা কী চাইতে পারতেন, সেদিকটা নির্দেশ করে; অর্থাৎ এগুলো তাঁর ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখে। তৃতীয় আইনটি, ভ্রাতাদের সমান অধিকার দেওয়া, পিতার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর যে নতুন বিন্যাসটি তৈরি হয়েছিল, তাকে চিরস্থায়ী করে রাখার প্রয়োজনীয়তার ভেতরই এর উদ্দেশ্যটি লুকিয়ে আছে। নইলে পুরোনো

বিন্যাসে ফিরে যাওয়াটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। এইখানে সামাজিক আইনগুলি অন্যগুলির থেকে আলাদা হয়ে গেল, যা একটা ধর্মীয় ব্যাপার থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হল।

একটি একক মানুষের সংক্ষিপ্ত বিকাশের মধ্যে সেই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়। এখানেও পিতামাতার কর্তৃত্ব, বিশেষ করে সর্বশক্তিমান পিতার কর্তৃত্ব, যিনি শাস্তিবিধানের ক্ষমতা ধরেন– তাঁর সন্তানের কাছ থেকে প্রবৃত্তি-দমন দাবী করে এবং তিনিই ঠিক করে দেন সে কী করতে পারে এবং কী কী করা নিষিদ্ধ। সন্তান যেটাকে "ভালো" বলে, অথবা "দুষ্টুমি," সেটাই পরিবর্তীকালে, যখন সমাজ এবং সুপার-ইগো তার পিতামাতার স্থান নেয়, নৈতিকতার নিরিখে "ভালো" অথবা "অসৎ," পূণ্যকর্ম বা পাপকর্ম হয়ে ওঠে। কিন্তু জিনিষটা একই থেকে যায়; একটা কর্তৃত্ব, যা পিতার পরিবর্ত হিসাবে উপস্থিত, তারই উপস্থিতির জন্য প্রবৃত্তি-দমন।

এইসব সমস্যার ভেতরে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আরো গভীরে প্রবেশ করে যখন আমরা পবিত্রতার যে অদ্ভূত ধারণা বা বোধ, সেটা অনুসন্ধান করি। অন্যান্য যে সব জিনিষকে আমরা যথেষ্ট সম্মান দিই এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় মনে করি, তাদের তুলনায় "পবিত্র" জিনিষটি আসলে কী? একদিকে, পবিত্র এবং ধার্মিক, এই দুটোর মধ্যে যোগসূত্র অভ্রান্ত; এটার ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই পবিত্র; এটা পবিত্রতার একেবারে মর্মস্থল। অপরদিকে, পবিত্রতার ব্যাপারে আরো অনেক রকম দাবীর পাল্লায় পড়ে আমাদের বিচার-বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়, যেমন-ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অনেক রকম প্রক্রিয়া যেগুলোর ধর্মের সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধই নেই। এই প্রচেষ্টাগুলো প্রায়ই উদ্দেশ্যমূলক। আমরা এখন ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নিষেধাজ্ঞা ব্যাপারটা নিয়ে এগোবো: পবিত্রতা এমন একটা ব্যাপার যাকে ছোঁয়া যাবে না। একটা পবিত্র নিষেধাজ্ঞায় একটা জোরালো আবেগময় সুর আছে, কিন্তু আসলে এর কোনো যুক্তিসহ প্রেরণা নেই। কারণ, কন্যা বা ভগ্নীর সঙ্গে যৌনসংসর্গ করলে কী এমন কুৎসিত অপরাধ করা হয়, যা অন্য কোনো যৌনসংসর্গে হয় না? আমরা যখন এর ব্যাখ্যা চাই, তখন আমাদের বলা হবে যে আমাদের সমস্ত বোধ এই অপরাধের বিরুদ্ধে সরব হয়। অথচ, এই সব কিছুর অর্থ এই যে, নিষেধাজ্ঞাটা আছে এবং স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে, আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব, জানি না।

আবার এই রকম ব্যাখ্যা যে অলীক তা সহজে প্রমাণ করা যায়। যে জিনিষটা আমাদের মানসিকতাকে আঘাত করে তা হচ্ছে একটা সাধারণ প্রথা– একটা পবিত্র ঐতিহ্যও বলা যায়– যেটা প্রাচীন ইজিপ্‌শিয়ানদের এবং অন্যান্য জাতির শাসক পরিবারের মধ্যে ছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রত্যেক ফারাও তাঁর ভগ্নীর মধ্যেই নিজের প্রথম এবং প্রধান স্ত্রীকে দেখতেন এবং

ফারাওদের উত্তরাধিকারীরা, গ্রিক টলেমি-রা এই উদাহরণ অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি। আমরা দেখতে পাই যে, নিষিদ্ধ আত্মীয়দের মধ্যে যৌন-সংসর্গ– এক্ষেত্রে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে– এটা একটা ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার, যেটা সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ অথচ রাজাদের জন্যে সংরক্ষিত, যে রাজারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিভূ। গ্রিক ও জার্মানদের পৌরাণিক কাহিনীর দুনিয়াতেও এই নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ কোনো ব্যতিক্রম নয়। আমরা ভাবতে পারি যে, আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে "পরিবার" সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা এই পুরোনো বিশেষ অধিকার বা সুবিধারই অবশেষ মাত্র, এবং আমরা দেখি যে, সর্বোচ্চ সামাজিক বৃত্তের মধ্যে অনেক পুরুষ ধরে চলে আসা নিজেদের মধ্যে যৌন সংসর্গের ফলে, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুকুটধারী রাজারা কার্যত একটিই পরিবার।

ঈশ্বর, রাজা এবং মহানায়কদের মধ্যে প্রচলিত এই নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয় যৌন-সংসর্গের দিকে তাকালে, আমরা আরও একটা ব্যাখ্যা পেতে পারি– যেমন, জীববিজ্ঞান মতে এই ধরনের নিষিদ্ধ যৌনসংসর্গের ভয়াবহতা এবং এই নিজেদের মধ্যে যৌনসংসর্গের ক্ষতিকারক দিকটা সম্বন্ধে একটা সহজাত জ্ঞান। যদিও এটা এখনও নিশ্চিত নয় যে, নিজেদের মধ্যে যৌনসংসর্গে কোনো বিপদ আছে আর আদিম জাতিরা এটা জানত এবং এর বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা নিত।

প্রাগৈতিহাসিক শক্তিগুলির পুনর্নির্মাণ করে আমরা আরও একটা ব্যাখ্যা পাই। অসবর্ণ বিবাহের যে আইন, যার বিপরীত প্রকাশ হচ্ছে নিষিদ্ধ যৌন-সংসর্গের ভয়, সেটা ছিল পিতার ইচ্ছায় এবং তার হত্যার পরও সেটা চলেছিল। সেইজন্যই এটার আবেগপ্রবণ করে তোলার শক্তি এবং একটা যুক্তিপূর্ণ প্রেরণার অসম্ভাব্যতা– অল্প কথায় এর পবিত্রতা। আমি বিশ্বাসের সঙ্গে অনুমান করি যে, পবিত্র নিষেধাজ্ঞা-যুক্ত অন্য সমস্ত বিষয়গুলোর অনুসন্ধান করলে, নিষিদ্ধ যৌনসংসর্গের ভয়-এর মতো একই ফল পাওয়া যাবে– যথা যা কিছু পবিত্র, সে সব আদিতে সেই প্রাচীন পিতারই স্থিরীকৃত ইচ্ছা ছিল। এতে এখনও পর্যন্ত অব্যাখ্যাত, শব্দটির দ্ব্যর্থবোধ ব্যাখ্যা করা যাবে, যেটায় পবিত্রতার ধারণা প্রকাশ করে। এই দ্ব্যর্থবোধই পিতার সঙ্গে সম্বন্ধটি নিয়ন্ত্রণ করে। "সাসের" কথাটা শুধুমাত্র "পবিত্র" "আশীর্বাদধন্য" এই অর্থই প্রকাশ করে না, আরও কিছু করে, যাকে আমরা অনুবাদ করলে পাই "অভিশপ্ত," "ঘৃণার যোগ্য" ("অরি স্যাক্রা ফেম্‌স্")। পিতার ইচ্ছা এমন একটা জিনিস, যাকে শুধু স্পর্শ করা যাবে না, উচ্চ সম্মান দিতে হবে, তাই নয়, এটা এমন জিনিস যেটাতে লোকে ভয়ে কাঁপবে, কারণ এটা একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রবৃত্তি-ত্যাগ দাবী করে। আমরা যখন শুনি যে, মোজেস সুন্নৎ-প্রথা প্রবর্তন করে তাঁর অনুগামীদের পবিত্র করেছিলেন, তখন আমরা এই দাবীর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারি। সুন্নৎ হচ্ছে পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়ার প্রতীকি বিকল্প, যেটা বহুদিন আগে প্রাচীন পিতা তাঁর পূর্ণ শক্তি

ব্যবহার করে সন্তানকে শাস্তি হিসাবে দিয়েছিলেন; এবং যে কেউ এই প্রতীক গ্রহণ করে দেখিয়েছিল যে, সে তার পিতার ইচ্ছার কাছে মাথা নত করছে, যদিও সেটা একটা যন্ত্রণাদায়ক আত্মত্যাগ।

নৈতিকতায় ফিরে আসা যাক; উপসংহারে বলতে পারি যে, এর অনুশাসনের একটা অংশ যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে– সম্প্রদায়ের অধিকারকে ব্যক্তির ওপর, ব্যক্তির অধিকারকে সম্প্রদায়ের উপর এবং ব্যক্তির অধিকার একজন আরেকজনকে অর্পণ করা। যদিও, যেটা রহস্যপূর্ণ, জাঁকজমকপূর্ণ এবং অতীন্দ্রিয়তায় স্পষ্ট বলে মনে হয়, সেটা ধর্মের সঙ্গে যোগসূত্র আছে বলেই হয়েছে, তার উৎস কিন্তু পিতার ইচ্ছার মধ্যেই নিহিত।

৬. ধর্মের মধ্যে সত্য

আমরা যারা অল্পবিশ্বাসী, তারা সেই সব লোকেদের কেমন ঈর্ষা করি, যারা একজন সর্বোচ্চ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যাঁর কাছে এই পৃথিবী কোনো সমস্যাই নয়, কেননা তিনিই এই পৃথিবী ও তার যাবতীয় যা কিছু, সব সৃষ্টি করেছেন। যারা বিশ্বাসী, তাদের মতবাদ কেমন ব্যাপক, সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত, অথচ তুলনায় আমরা যে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি, সেগুলো কষ্টকর, জোড়াতালি-দেওয়া, অত্যন্ত নগণ্য। পবিত্র আত্মা, যিনি নিজেই নৈতিক সম্পূর্ণতার আদর্শ, তিনিই মানুষের আত্মার মধ্যে এই আদর্শের জ্ঞানবীজ রোপন করেছেন এবং একই সঙ্গে মানুষকে এই আদর্শের কাছে পৌছানোর অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন : মানুষও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছে কোন্‌টা উচ্চমার্গের, কোন্‌টা মহান এবং কোন্‌টাই বা নিম্নমার্গের এবং জঘন্য। তাদের ভাবপ্রবণ জীবনকে আদর্শ থেকে দূরত্ব দিয়ে মাপা হয়। এতে তারা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করে, যখন তারা– বলা যায়, অনুসূর অবস্থায়– আদর্শের খুব নিকটে চলে আসে; এবং এদের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলে শাস্তি দেওয়া হয়, যখন তারা অপসূর অবস্থায়– আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। এগুলো খুব সহজ এবং অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কেবলমাত্র দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, যদি জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, এই রকম একজন সর্বোচ্চ শক্তির প্রকল্পকে গ্রহণ করা অসম্ভব করে তোলে। আমাদের এখন দেখতে হবে, যাদের এক স্বর্গীয় শক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, তারা কীভাবে এই বিশ্বাস অর্জন করেছিল এবং কোথা থেকে এই বিশ্বাস সেই বিপুল শক্তি আহরণ করেছিল, যা দিয়ে কারণ এবং বিজ্ঞানকেও জয় করা যায়।

আমরা ব্যাখ্যা করতে চাইছি যে, ইহুদি জাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোথা থেকে এল, যার ফলে তারা এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তি মোজেস তাদের চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন এমন একটা ধর্ম তাদের দিয়ে, যেটাতে তাদের আত্মবিশ্বাস এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেদের অন্য

সমস্ত জাতিদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তারা অন্যদের কাছ থেকে আলাদা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। রক্তের মিশ্রণে বিশেষ কোনো তফাৎ হয়নি, কারণ একটা আদর্শ তাদের ঐক্য বজায় রেখেছিল– তাদের কিছু বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগপূর্ণ মূল্যবোধ, যা তাদের সকলের মধ্যেই ছিল। মোজেইক ধর্মের এই ফলগুলি ছিল (১) কারণ, এই ধর্ম জাতিকে তাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত নতুন ধারণার চমৎকারিত্বে অংশগ্রহণ করিয়েছিল। (২) কারণ, এই ধর্মে বলা হচ্ছিল যে, এই মহান ঈশ্বর এই জাতিকে "নির্বাচিত" করেছেন এবং তাঁর বিশেষ আনুকূল্য উপভোগ করবে, এবং (৩) কারণ, এই ধর্ম জাতিকে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এনে দেবে, যেটা আরো বুদ্ধিদীপ্ত কাজকর্মতে এবং প্রবৃত্তি দমনে বাধ্য করে সম্মান এর রাস্তা খুলে দেবে।

এই হচ্ছে আমাদের উপসংহার, কিন্তু আমি যা কিছু বলেছি তা যদিও ফিরিয়ে নেব না, তবু আমার মনে হচ্ছে যে, ব্যাপারটা ঠিক সন্তোষজনক নয়। কারণটা ফলের সঙ্গে সুসামঞ্জস নয়। যে সত্যটা আমরা উদ্ঘাটন করতে চাইছি, তা যেন আমরা যা কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এটা কি হতে পারে যে, আমাদের সব অনুসন্ধান, পুরো প্রেষণাকে উদ্ঘাটন করতে পারেনি, শুধু ওপরের পাতলা স্তরটাই আবিষ্কার করেছে, এবং এর পেছনে আর একটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে? যদি বিবেচনা করি যে, জীবনের এবং ইতিহাসের সব ঘটনাই কী অসম্ভব জটিল, তাহলে হয়ত আমরা এ রকম একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি।

এই অন্তর্নিহিত প্রেষণা-র পথ শুরু হচ্ছে পূর্বে আলোচিত একটা পরিচ্ছেদ থেকে। মোজেসের ধর্ম সঙ্গে সঙ্গেই তার ফলাফল পায়নি, একটা অদ্ভুত অপ্রত্যক্ষভাবে সেটা এসেছে। তার মানে এই নয় যে, ধর্মের কোনো কার্যকারিতা হয়নি। প্রচুর সময় লেগেছিল এটা হতে, অনেক শতাব্দী; জাতির চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য। আমরা এর যে পরিবর্তনটা করছি সেটা আমরা ইহুদি ধর্মের ইতিহাস থেকে নিয়েছি, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, ইতিহাসে যেটা ঢোকানো হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, ইহুদিরা মোজেসের ধর্ম কিছুকাল পরে সরিয়ে দিয়েছিল; অবশ্য আমরা বলতে পারি না, ওরা ধর্মটা পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিল কিনা, অথবা তার কিছু কিছু নির্দেশ ধরে রেখেছিল কিনা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ক্যানান দখলের দীর্ঘকালীন লড়াই এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘাত-এর সময়ে যাহ্ভে ধর্মের, অন্যান্য ফিনিশিয় দেবতাদের (আলিম) পূজার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, তাহলে আমরা ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে থাকব, যদিও পরবর্তীকালে এই লজ্জাজনক পরিস্থিতিকে মুছে ফেলবার অনেক উদ্দেশ্য প্রণোদিত চেষ্টা করা হয়েছিল। মোজেসের ধর্ম, এসব সত্ত্বেও ধ্বংস হয়নি। একধরনের স্মৃতি, অস্পষ্ট, বিকৃত হলেও বেঁচেছিল, বোধ হয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের কেউ না কেউ প্রাচীন লিপিতে

লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। মহান অতীতের এই ঐতিহ্যই পশ্চাৎপট থেকে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল; এবং ধীরে ধীরে জাতির মনের মধ্যে আরো শক্তি আহরণ করছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেবতা যাহ্‌ভে-কে মোজেসের ঈশ্বরে পরিবর্তিত করে, বহু শতাব্দী আগে মোজেস যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, সেই পরিত্যক্ত ধর্মকে পুনরায় জীবিত করে তুলেছিল।

৭. অবদমিতের প্রত্যাবর্তন

মানসিক জীবনের বৈশ্লেষিক তদন্তে যা জানা গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি অনুরূপ প্রক্রিয়া রয়েছে। তাদের কিছু কিছুকে প্যাথলজিক্যাল বলা হয়; অন্যগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ। এতে অবশ্য বিশেষ কিছু যায় আসে না, কারণ এই দুই-এর মাঝখানের সীমারেখা ঠিকমত নির্দিষ্ট করা নেই এবং এদের কার্যসাধন কিছুদূর পর্যন্ত একই। এটা দেখাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, পরিবর্তন ইগোর মধ্যে হয়, নাকি এরা ইগোর কাছে অপরিচিত বিদেশির মত মুখোমুখি হয়; দ্বিতীয়টি হলে তাকে বলা হয় লক্ষণ। আমার কাছে যা উপাদান আছে, তা থেকে আমি কয়েকটি বিষয় বেছে নেব, যাতে চরিত্র গঠন ব্যাপারটা বোঝা যায়।

একটি অল্পবয়সি মেয়ে তার মা-য়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে বড় হয়ে উঠেছে; ওর মায়ের মধ্যে যে সব গুণ ও দেখতে পায়নি, সেগুলোই ও নিজের চরিত্রে বিকশিত করেছে এবং মা-য়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বর্জন করেছে। অবশ্য একথা বলতে হবে যে, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে সে নিজেকে মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ করত– অন্য যে কোনো কন্যা সন্তানের মতো– অথচ এখন সে ওই একাত্মবোধের জোরের সঙ্গে বিরোধিতা করছে। যখন এই মেয়েটি বিয়ে করল এবং একজনের স্ত্রী হল ও পরে মা হল, তখন আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে, ও আস্তে আস্তে নিজের মায়ের মতোই হয়ে উঠেছে, যে মায়ের প্রতি ও শত্রুভাবাপন্ন ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত যে মাতৃপরিচিতি ও জয় করেছিল, সেটাই ঘুরে এল। একই জিনিষ ছেলেদের ক্ষেত্রেও ঘটে। এমনকি মহান গ্যেটে, যিনি তাঁর "স্টার্ম আণ্ড ড্র্যাং"-এর সময়ে তাঁর স্কুল-শিক্ষক-সুলভ ও কঠোর পিতাকে মোটেই শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁর নিজের বৃদ্ধ বয়সে পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়েছিল। যখন পিতা ও সন্তানের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি খুব স্পষ্ট, তখন এই জিনিষটা ভাল ভাবে ফুটে ওঠে। একটা অল্পবয়সি ছেলে, যে কিনা তার অপদার্থ বাবার কাছে বড় হয়েছে, প্রথমদিকে একজন সমর্থ, বিশ্বস্ত ও সম্মানীয় মানুষ হয়ে উঠেছিল। অথচ তার পূর্ণ যৌবনে, তার চরিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল এবং তারপর থেকে তার ব্যবহারের মধ্যেও যেন তার পিতার উদাহরণ ফুটে উঠতে লাগল। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই প্রক্রিয়ার শুরুতে, একেবারে শৈশবের দিনগুলো থেকেই পিতার সঙ্গে একটা একাত্মতা সবসময়েই থেকেই যায়। সেটা পরে

অস্বীকৃত হয়, এমনকি অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এবং একদম শেষে এটা ধরা পড়ে।

এটা দীর্ঘদিন থেকেই জানা আছে যে, শৈশবের প্রথম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে একটা চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে, যেটা পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ বৃথাই বিরোধিতা করে। এই শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলো, পরিপক্ক বয়সের পরিবর্তন করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে কীভাবে প্রতিহত করে, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু সেগুলো প্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও এটা সবাই জানে না যে, শিশুর সবচেয়ে শক্তিশালী আসক্তিকারী প্রভাবগুলো সেইসব অভিজ্ঞতা থেকে আসে যার মধ্যে দিয়ে শিশুটি পার হয় এমন একটা সময়ে যখন তার সেগুলো গ্রহণ করার ও বুঝবার মতো মানসিক বিকাশই ঘটেনি। এই ব্যাপারটা যদিও সন্দেহের অতীত, তবুও এটা সহজ করে বোঝার জন্য একটা উপমা প্রয়োগ করা যায়: প্রক্রিয়াটাকে একটা ফটোগ্রাফের সাথে তুলনা করা যায়, যেটা বিকশিত করে অল্প সময়ে অথবা দীর্ঘ বিরতির পর ছবিতে রূপান্তরিত করা যায়। এখানে আমি বলতে চাই যে, একজন কল্পনাপ্রবণ লেখক, লেখক-সুলভ স্বাধীনতা প্রয়োগ করে আমার সামনে এই গোলমেলে আবিষ্কারটি করেছিলেন। ই.টি.এ. হফম্যান যখন মায়ের কোলের শিশু ছিলেন, সেই সময়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘোড়ার গাড়িতে লম্বা সফরে তিনি সতত পরিবর্তনশীল যেসব দৃশ্য দেখেছিলেন এবং তাঁর মনের ওপর যে সমস্ত ছবি বা ঘটনার ছাপ পড়েছিল, তাই দিয়ে তিনি তার গল্পের কাল্পনিক চরিত্রগুলির সমৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতেন। একটি শিশু দু'বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত যেসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় এবং যা সে বুঝতে পারে না, সেগুলি সে হয়ত কখনোই আর মনে করতে পারবেনা, কেবল তার স্বপ্নের মধ্যে ছাড়া। শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা চিকিৎসার মাধ্যমেই সে ওইসব ঘটনার সম্বন্ধে সচেতন হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে, অবশ্য, যে কোনো সময়ে, এগুলি তার জীবনে একটা আবিষ্ট আবেগ-প্রবণতা নিয়ে ফুটে উঠতে পারে, তার দৈনন্দিন কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মানুষকে পছন্দ করা বা অপছন্দ করার ব্যাপারগুলোতে বাধ্য করতে পারে এবং প্রায়শঃই তার ভালোবাসার পাত্র-কে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে পারে এবং তাতে কোনো যুক্তিযুক্ততা থাক্ আর নাই থাক। যে দুটো বিষয় আমাদের সমস্যায় আসছে, সেগুলি অভ্রান্ত। প্রথম, সময়ের দূরত্ব, যেটা প্রকৃত চূড়ান্ত কারণ বলে এখানে বিবেচিত, যেমন কিনা, স্মৃতির বিশেষ অবস্থা, যা এই সব শৈশবের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা "অচেতন" বলে থাকি। যে মানসিক অবস্থাকে আমরা ঐতিহ্যের ওপর আরোপ করি, যখন সেটা কোনো জাতির মানসিক আবেগপ্রবণ জীবনে সক্রিয় থাকে, তার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক কিছু এই নিবন্ধে আমরা আশা করি পাব। অবশ্য এও সত্যি যে, জনমনস্তত্ত্বে অচেতনের ধারণার উপস্থাপনা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

যে বিষয়টি আমরা খুঁজছি তাতে, স্নায়বিক পীড়া উৎপন্নকারী কার্যপ্রক্রিয়া নিয়মিত অবদান রাখে। এখানেও অতি শৈশবের সেই চূড়ান্ত অভিজ্ঞতাগুলো চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়, তথাপি এই ধরণের ক্ষেত্রে সময়ের ওপরে নয়, সেই ঘটনার বিরোধী প্রক্রিয়ার ওপর, তার বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ওপরই জোর দেওয়া হয়। উপলব্ধির সহায়ক রূপে প্রকাশ করলে এটা এই রকম দাঁড়ায়: কোনো একটি অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ একটা সহজাত প্রবৃত্তির দাবী ওঠে, যেটা চরিতার্থতা চায়। ইগো সেই চরিতার্থতা বর্জন করে, হয় দাবীর অতিরিক্ততায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে, না হয়, এর ভেতর কোনো বিপদের গন্ধ পেয়ে। প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই আসল; দুটোই অবশ্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়ানোতে শেষ হয়। ইগো, দমনের দ্বারা এই বিপদের বিরুদ্ধে পাহারা দেয়। উত্তেজনা একভাবে বা অন্যভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়; উদ্দীপনা, তার পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি সহ বিস্মৃত হয়। এতে অবশ্য প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে যায় না; সহজাত প্রবৃত্তি হয় তার জের ধরে রাখে, অথবা সেটা পুনরায় ফিরে পায়, অথবা নতুন কোনো পরিস্থিতিতে পুনর্জাগরিত হয়। তখন সে তার দাবী নতুন করে রাখে, এবং যেহেতু দমনের ক্ষতের আঘাত-চিহ্ন দ্বারা স্বাভাবিক চরিতার্থতার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে– সে তখন কোনো দুর্বল মুহূর্তে তথাকথিত প্রতিস্থাপিত চরিতার্থতার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, যেটা তখন ইগোর মৌনসম্মতি ছাড়া এবং উপলব্ধি ছাড়াই লক্ষণ হয়ে প্রতিভাত হয়। এই লক্ষণ তৈরি হওয়ার সমস্ত ব্যাপারটাকেই "অবদমিতের প্রত্যাবর্তন" বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক চরিত্র, ফিরে আসা উপাদানগুলোর আদিতে যে চেহারায় ছিল, তার তুলনায় যথেষ্ট বিকৃত চেহারার মধ্যেই থাকে। হয়ত আপত্তি উঠবে যে, এই শেষ পর্যায়ের বক্তব্যগুলোতে আমি ঐতিহ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের ব্যাপারটা থেকে বড় বেশি সরে গেছি। কিন্তু এতে যদি আমরা সহজাত প্রবৃত্তি-দমনের সমস্যার কাছাকাছি আসতে পেরে থাকি তাহলে আমার দু:খিত হওয়ার কিছু নেই।

৮. ঐতিহাসিক সত্য

আমি এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অপ্রাসঙ্গিকতা এনেছি এই কথাটি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে যে, মোজেসের ধর্ম যখন একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, তখনই কেবল ইহুদি জাতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা একটা সম্ভাব্যতার চেয়ে বেশি কিছু পাইনি। তবুও ধরে নেওয়া যাক, আমরা এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি; তবু কিন্তু একটা ধারণা থেকে যাবে যে, আমরা আমাদের কাজের গুণগত মান সফল করেছি, সংখ্যাগত নয়। একটা ধর্ম সৃষ্টি করার ব্যাপারে যাবতীয় যা কিছু– এবং নিশ্চয়ই ইহুদিদের ধর্মের ব্যাপারেও– একটা মহিমান্বিত কিছু আছে, যেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের ব্যাখ্যা

করা হয়নি। আরো অন্য উপাদান এর অংশ হওয়া উচিত; যার কোনো সাদৃশ্যমূলক কিছু থাকবেনা, সেটি হবে অনন্য এবং তার থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে, তার সঙ্গে মানানসই হবে, ধর্মের মতোই কিছু।

দেখা যাক, উল্টো দিক থেকে আমাদের বিষয়টিতে আসা যায় কিনা। আমরা জানি যে, আদিম মানবের পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, তার জাতির প্রভূ হিসাবে এবং তাদের যত্ন নেবে, রক্ষা করবে এই হিসাবে, একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল। এই ঈশ্বর তাদের মৃত পিতাদের পরেই নিজের জায়গা করে নেবে আর এই পিতাদের সম্বন্ধে ঐতিহ্যেরও কিছু বলার আছে। মানুষ পরবর্তীকালে– ধরা যাক আমাদের কালেই– একইরকম ব্যবহার করে। সে শিশুসুলভ থাকে এবং বয়স হলেও নিরাপত্তা চায়; সে মনে করে ঈশ্বরের আনুকূল্য পরিত্যাগ করা যাবে না। এ পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু মাত্র একজন ঈশ্বর কেন থাকবেন, বহু ঈশ্বরের মধ্যে একজন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, এই মত থেকে একেশ্বরবাদে অগ্রগতি কেন এত অসাধারণ গুরুত্ব পাবে, এ ব্যাপারটা সহজে বোঝা যায় না। একথা সত্যি, যেমন আমি আগে বলেছি যে, বিশ্বাসী ঈশ্বরের মহানতায় অংশগ্রহণ করে, এবং ঈশ্বর যত শক্তিশালী হবেন, তত নিশ্চিতভাবে তিনি বিশ্বাসীকে রক্ষা করতে পারবেন। একজন ঈশ্বরের শক্তি যদিও বলেনা যে, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর ; অনেক জাতিই তাদের প্রধান ঈশ্বরকে আরো বেশি মহিমান্বিত করে তুলত, যদি তিনি আরো অনেক ছোট ছোট দেবতার ওপর প্রভূত্ব করতেন; তিনি ছাড়াও অন্য দেবতারা ছিলেন বলে তাঁর মহিমা একটুও কম হত না। তবে, যদি ঈশ্বর সর্বজনীন হতেন এবং সকল দেশ ও জাতিকে সমানভাবে দেখতেন, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা খানিকটা ত্যাগ করতে হত। একজনকে তার ঈশ্বরকে অন্য অপরিচিতের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হত এবং সে নিজের ক্ষতিপূরণ করত এই বিশ্বাসে যে, ঈশ্বর তাকেই বেশি অনুগ্রহ করেন। একথা বলা যায় যে, একমাত্র ঈশ্বরের ধারণা আধ্যাত্মিকতার দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া নির্দেশ করে; যদিও একথা খুব বেশি জোর দিয়ে বলা যায় না।

সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে যে, একমাত্র ঈশ্বরের মানবজাতির ওপর এই সর্বব্যাপী ক্ষমতা আছে কারণ, এটা চিরন্তন সত্যের একটা অংশ, যেটা এতদিন লুকোনো ছিল এবং শেষপর্যন্ত আলোয় উদয় হয়ে, সামনের সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্বের সঙ্গে এবং তার প্রভাবের সাফল্যের সঙ্গে মানানসই একটা বিন্যাসের উপাদান পেয়েছি।

মানুষের মেধা যে খুব ভালো সত্যসন্ধান করতে পারে বা সত্যকে গ্রহণ করার মতো তাৎক্ষণিক মানসিক প্রস্তুতি থাকতে পারে, তা কিন্তু অন্যত্র দেখা যায় না। উল্টোদিকে, এটাই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, মানুষের বুদ্ধি সহজেই ভুল করে, কিন্তু সেটা ধরতে পারে না এবং যা কিছু আমাদের ইচ্ছা ও কল্পনার কাছাকাছি

আসে, তাকেই, সত্য হোক বা না হোক, সহজেই বিশ্বাস করে নেয়। সেইজন্যে, আমাদের চুক্তিটা বদলানো দরকার। একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে, তার মধ্যে সত্য আছে বলে আমি সম্মান দেব, যদিও সেটা বাস্তব সত্য নয়, একটা ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য যখন পুনরায় আবির্ভূত হল, তখন তার মধ্যে যে বিকৃতিটা এসেছিল, সেটা সংশোধন করার অধিকার আমি দাবী করছি। অর্থাৎ, বর্তমানে একজন সর্বোচ্চ মহান ঈশ্বর "আছেন" একথা আমি বিশ্বাস করিনা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন যুগে একজন মানুষ ছিলেন, যিনি অন্য সব মানুষের মধ্যে বিশাল বলে প্রতীয়মান হয়েছিলেন, এবং যিনি, একজন দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হবার পর, মানুষের স্মৃতিতে আবার ফিরে এসেছেন।

আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, মোজেসের ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং অংশতঃ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেটা আবার ঐতিহ্যের রূপে জাতির মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বলতে চাই যে, এই প্রক্রিয়াটি পূর্বের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। যখন মোজেস তাঁর জাতিকে একমাত্র ঈশ্বরের ধারণাটা দিয়েছিলেন তখন সেটা কিন্তু কোনো নতুন ধারণা ছিল না, কারণ তার অর্থ ছিল মানব পরিবারের সেই আদিম যুগের অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন যেটা দীর্ঘদিন আগেই মানুষের চেতন স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মানুষের জীবনে এমনই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল বা অন্ততঃ প্রস্তুত করেছিল যে তা নিশ্চয়ই মানুষের আত্মার মধ্যে কিছু চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে– যেটাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

একটি ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ থেকে আমরা শিখেছি যে, তাদের একদম গোড়ার দিকের মানসিক ছাপগুলি যা তারা কথা বলতে শেখার আগেই পেয়েছিল, পরবর্তীকালে একটা আবিষ্টতার রূপে প্রকাশিত হয়, যদিও সেই ছাপগুলি সচেতনভাবে স্মৃতিতে থাকে না। আমরা মনে করি, এই একই কথা মানবজাতির প্রাচীনতম অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর একটা ফল হচ্ছে, একজন মহান ঈশ্বরের ধারণার আবির্ভাব। এটাকে একটা স্মৃতি হিসাবেই ধরতে হবে– হতে পারে একটা বিকৃত স্মৃতি, কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটা স্মৃতি তো বটেই। এর একটা আবিষ্টতার গুণ আছে; একে বিশ্বাস করতেই হবে। এর বিকৃতি যা আছে, তাকে একটা প্রবঞ্চনা বলা যায়; অতীত থেকে কিছু নিয়ে এসে আলোতে উদ্ভাসিত করাটাকে সত্য বলতেই হবে। মনস্তাত্ত্বিক প্রবঞ্চনা বা ভ্রান্তিতেও কিছু সত্য থাকে; রোগীর বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এর থেকেই এবং এটা এর চারধারের সমস্ত মোহজালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী পাতাগুলি আমি প্রথম অংশে যা বলেছি, তারই সামান্য বদলানো পুনরাবৃত্তি। ১৯১২ সালে আমার 'টোটেম অ্যান্ড টাবু' বইয়ে আমি, যে প্রাচীন পরিস্থিতি থেকে এই সমস্ত পরিণতিগুলোর উদ্ভব হয়েছে, তা পুনর্নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছি। ওই বইয়ে, আমি চার্লস ডারউইন, জে. জে. অ্যাটকিন্‌সন এবং

বিশেষ করে রবার্টসন স্মিথের তত্ত্বীয় মতবাদগুলো ব্যবহার করেছি এবং সেগুলিকে মনোবিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সঞ্চারিত ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছি। ডারউইনের কাছ থেকে আমি এই তত্ত্ব ধার করেছি যে, আদিতে মানবজাতি ছোট ছোট দলে বাস করত; প্রতিটি দল বা গোষ্ঠি একজন বয়স্ক পুরুষ দ্বারা শাসিত হত, যে নির্মম পাশবিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে শাসন কার্য চালাত, সমস্ত নারীগুলিকে করায়ত্ত করত এবং অন্য অল্পবয়সি পুরুষগুলিকে হয় আহত করত, নয়, মেরে ফেলত, তাদের মধ্যে নিজের পুত্ররাও থাকত। অ্যাটকিন্সনের কাছ থেকে আমি এই ধারণাটা পেয়েছিলাম যে, এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরুষ সন্তানদের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল, যে সন্তানেরা পিতার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে, পিতাকে পরাভূত করে, সকলে মিলে তার মাংস ভক্ষণ করেছিল। রবার্টসন স্মিথের টোটেমতত্ত্ব অনুধাবন করে, আমি বলেছিলাম যে, এই গোষ্ঠি, যেটা আগে পিতা শাসন করত, পরবর্তীকালে টোটেমীয় ভ্রাতা-সঙ্ঘ দ্বারা শাসিত হত। পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করবার জন্যে বিজয়ী ভ্রাতারা, যে নারীদের জন্যে তাদের পিতাকে হত্যা করেছিল, তাদের বর্জন করল এবং অসবর্ণ বিবাহ করতে রাজী হল : পিতার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল এবং মাতৃতন্ত্র দ্বারা পরিবারগুলি নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। পরবর্তী সম্পূর্ণ বিকাশকালে পিতার প্রতি এই দ্বৈত মনোবৃত্তি বা উভয়বলতা, বজায় ছিল। পিতার পরিবর্ত হিসাবে, কোনো একটা পশুকে টোটেম বলে ঘোষণা করা হল; তাকে তাদের পূর্বপুরুষ এবং নিরাপত্তা প্রদানকারী শক্তি হিসাবে গণ্য করা হত, এবং তাকে আঘাত করার বা হত্যা করার অধিকার কারো ছিল না। বছরে একবার, সমস্ত গোষ্ঠি একটা ভোজ উৎসবে জড়ো হত এবং সেখানে ওই সম্মানীয় টোটেম পশুটিকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলা হত; এটাই ছিল তাদের পিতাকে হত্যা করার পবিত্র পুনরাবৃত্তি যার মধ্যে থেকেই তাদের সামাজিক বিন্যাস ও শৃঙ্খলা, নৈতিক অনুশাসন এবং ধর্মের সূত্রপাত ঘটেছে। এই টোটেম ভোজ উৎসব (রবার্টসন স্মিথের বর্ণনা অনুযায়ী)-এর সাথে খ্রিস্টানদের কমিউনিয়ন ভোজ-এর সাদৃশ্য আমার আগে অনেক লেখককেই নাড়া দিয়েছে।

আমি এখনও এই ভাবধারা পোষণ করি। আমার বই-এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে আমি আমার মতামত পরিবর্তন করিনি বলে আমাকে অনেক ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে, কারণ আরো সাম্প্রতিক জাতিবিজ্ঞানীরা এককথায় রবার্টসন স্মিথের তত্ত্ব ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন এবং সেগুলোর জায়গায় অংশতঃ অন্য তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন, যা অনেকাংশে আলাদা। আমার উত্তর এই যে, বিজ্ঞানের এই তথাকথিত অগ্রগতি আমার ভালোই জানা আছে। তথাপি, আমি এই দ্বিতীয় তত্ত্বগুলির নির্ভুলতা বা রবার্টসন স্মিথের তত্ত্ব ভুল, এ নিয়ে খুব একটা প্রত্যয়ী নই। একটা নতুন তত্ত্ব সবসময়েই অগ্রগতি নির্দেশ করে না, বিরোধ করা মানেই, অপ্রমাণ করা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমি একজন জাতিবিজ্ঞানী নই, আমি একজন মন:

সমীক্ষণবিৎ। আমার বিশ্লেষণী কাজে সাহায্য করে জাতিবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত এমন কোনো তথ্য নির্বাচন করে নেওয়ার অধিকার আমার আছে। উচ্চস্তরের মেধা সম্পন্ন রবার্টসন স্মিথের লেখা থেকে আমার মনঃ সমীক্ষণের কাজে ব্যবহার করার মতো অনেক মূলবান তথ্য আমি পেয়েছি। তাঁর বিরোধীদের লেখা সম্বন্ধে আমি একথা বলতে পারি না।

৯. ঐতিহাসিক বিকাশ

এখানে আমি "টোটেম অ্যান্ড টাবু" বইয়ের বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করবনা, কিন্তু প্রাচীনকালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল বলে আমি বিবৃত করেছি এবং ঐতিহাসিক সময়কালেই একেশ্বরবাদের জয়– এই দুই এর মধ্যে যে বিশাল সময়ের ব্যবধান ছিল, সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, মাতৃতন্ত্র, অসবর্ণ বিবাহ এবং টোটেমিজম এই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে এমন একটা বিকাশ শুরু হল, যাকে একটা ধাঁর "উৎপীড়িতের প্রত্যাবর্তন" হিসাবে বর্ণনা করা যায়। উৎপীড়িত কথাটা এখানে তার প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। এখানে আমি বলতে চেয়েছি, একটা জাতির জীবনের কিছু অতীত, মুছে যাওয়া এবং জয় করা জিনিষের কথা যেটা আমি একটা ব্যক্তির মানসিক জীবনে দমিত বিষয়গুলির সমতুল্য বলে গণ্য করার সাহস করছি। আমরা এখনও পর্যন্ত বলতে পারি না, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে অতীত কী রকম মনস্তাত্ত্বিক চেহারায় ছিল। ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের ধারণাকে গণ-মনস্তত্ত্বের ধারণাতে অনুবাদ করা সহজ নয়, এবং আমি মনে করিনা যে, একটা "সমবেত" অচেতন-এর ধারণাকে এনে ফেললে বিশেষ কিছু লাভ হবে। অচেতন-এর ভেতরের যে বস্তু, সেটা 'সমবেত' তো নিশ্চয়ই, মানবজাতির সাধারণ অধিকারগত। কাজেই সাদৃশ্য-জাতীয় তথ্য ব্যবহার করলে আমাদের কাজে সাহায্য হবে। মানুষের জীবনের যে প্রক্রিয়া এখানে আলোচনা করছি, সেগুলি মনস্তত্ত্বের চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াগুলির অনুরূপ, কিন্তু তবুও তারা একরকম নয়। আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সেই প্রাচীন যুগের মানসিক অবশিষ্টাংশ এখন একটা উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটা প্রত্যেক নতুন নতুন প্রজন্মে জাগরিত করা যায়, কিন্তু পুনরায় অর্জন করতে হয় না। এখানে বাচন-প্রক্রিয়ার প্রতীক হিসাবে উদাহরণ টানা যেতে পারে, যেটা নিশ্চিতই জন্মার্জিত। এটা বাচন প্রক্রিয়ার বিকাশের সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল এবং কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা না থাকলেও সব শিশুরাই জানে।

ভাষার পার্থক্য থাকলেও সব জাতির মানুষের ক্ষেত্রেই এটা একই। যেটা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, সেটা আমরা মনঃ সমীক্ষণের অন্য ফলাফল থেকে পেতে পারি। আমরা শিখেছি যে, আমাদের সন্তানেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আমাদের যে প্রত্যাশা জাগায়, তেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে

না, করে পশুদের মতো সহজাত প্রবৃত্তিবোধে; এটা কেবলমাত্র প্রাণীবর্গের জেনেটিক উত্তরাধিকার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।

এই অবদমিতের ফিরে আসাটা কিন্তু খুব ধীরে ধীরে হয়। এটা অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় না, সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে ব্যাপৃত জীবনের অবস্থায় যে পরিবর্তনগুলি হয়, তারই প্রভাবে এই ফিরে আসাটা ঘটে। জীবনের যে অবস্থার ওপর এটা নির্ভর করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখানে আমি দিতে পারব না, বা যে ধাপে ধাপে এই প্রত্যাবর্তনটা হয়, তার সামান্য বিবরণ ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না। পিতা আবার পরিবারের কর্তা হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি এখন আর সেই প্রাচীন গোষ্ঠির পিতার মতো সর্বশক্তিমান থাকলেন না। স্পষ্ট বোধগম্য পরিবর্তনের ধাপে ধাপে টোটেম পশুটি উৎখাত হয়ে গেল ঈশ্বর দ্বারা। ঈশ্বরের, মানুষের আকৃতি-ধারী, প্রথম দিকে মাথাটা ছিল পশুর; পরবর্তীকালে তিনি সেই পশুর দেহ ধারণ করতে লাগলেন। আরো পরে, সেই পশু তাঁর কাছে পবিত্র হয়ে গেল এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গী হয়ে গেল, অথবা তিনি সেই পশুটিকে হত্যা করলেন বলে কথিত আছে; যখন তিনি তাঁর নামের সঙ্গে পশুটির নামও যুক্ত করে নিলেন। এই টোটেম পশু এবং ঈশ্বরের মাঝখানে নায়ক তার অস্তিত্ব প্রকট করল; এটা ছিল প্রায়ই দেবত্ব আরোপ করার প্রথম ধাপ। সর্বোচ্চ শক্তির ধারণাটা মনে হয়, শুরুতেই এসেছিল; প্রথম দিকে ধারণাটা ছিল ভাসা-ভাসা এবং মানবজাতির দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ছিল না। যেমন বিভিন্ন জাতি, উপজাতি এক হতে লাগল, বড় বড় জাতিতে পরিণত হল, দেবতারাও তেমনি পরিবারে এবং দেবদূত শ্রেণীতে বিন্যস্ত হলেন। প্রায়ই, এই দেবতাদের মধ্যে একজনকে বাকি দেবতাদের ও মানবজাতির প্রভূ হিসাবে উন্নীত করা হত। পরবর্তী ধাপ, কেবলমাত্র একজন ঈশ্বরের পূজা দ্বিধাগ্রস্তভাবে করা হত, এবং দীর্ঘ দিন পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সমস্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র একজন ঈশ্বরেই থাকবে এবং তিনি ছাড়া আর অন্য কোনো ঈশ্বর থাকবেন না। কেবল তখনই, সেই প্রাচীন পিতার মহিমার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল; এবং সেই পিতার যে আবেগগুলি ছিল, সেগুলি এখন পুনরাবৃত্ত হতে পারে।

মানুষ বহুদিন যাবৎ যার অভাব অনুভব করছিল এবং আকাঙ্খা করছিল, তার সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রথম ফল ছিল সুদূর প্রসারী এবং সিনাই পর্বতে ধর্মের অনুশাসনগুলি প্রদানের যে ঐতিহ্য ছিল, হুবহু তার মতো। ছিল শ্রদ্ধা, ভয় ও কৃতজ্ঞতা, কারণ জাতি তাঁর কাছে আনুকূল্য পেয়েছিল; মোজেসের ধর্ম পিতা ঈশ্বরের প্রতি কেবলমাত্র এই যথার্থ আবেগের কথা জানে। তাঁর ক্ষমতা যে অপ্রতিরোধ্য, এই দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁর ইচ্ছার প্রতি বশ্যতাস্বীকার, এগুলি সেই গোষ্ঠিপিতার অসহায়, ভীত পুত্রের কাছে, এখানে যেমন, তেমনি চূড়ান্ত ছিল; প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সেই প্রাচীন ও শিশুসুলভ সামাজিক পরিবেশে রূপান্তরিত হলেই সেগুলি সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়ে ওঠে। শিশুসুলভ অনুভূতিগুলো খুবই তীব্র

এবং বয়স্কদের অনুভূতির চাইতে অনেক বেশি গভীরের ব্যাপার; শুধু ধর্মীয় উন্মাদনাই এই তীব্রতা ফিরিয়ে আনতে পারে। কাজেই, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ভাবাবেগই হচ্ছে পরমপিতার প্রত্যাবর্তনে প্রথম প্রতিক্রিয়া।

এই পিতৃধর্মের দিক্‌নির্দেশ চিরকালের জন্যই স্থির করা ছিল, কিন্তু এর দ্বারা তার বিকাশ কখনোই শেষ হয়ে যায়নি। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের নির্যাসই ছিল দুই বিপরীত আবেগের ভালোবাসা ও ঘৃণা-র সহাবস্থান; এটা ঘটার ছিল যে, সময়ের সাথে সাথে, পিতা-পুত্রের বৈরীতা আবার নাড়া খেয়ে জেগে উঠবে, যেটা প্রাচীন যুগে পুত্রদের প্ররোচিত করেছিল তাদের শ্রদ্ধেয় এবং ভয়ঙ্কর পিতাকে হত্যা করতে। মোজেসের ধর্মে এই জিঘাংসা-মূলক পিতৃ-ঘৃণা খোলাখুলি প্রকাশ করার কোনো জায়গা ছিল না। শুধু এর একটা জোরালো প্রতিক্রিয়া হয়ত বেরিয়ে আসতে পারত : তা হল, এই শত্রুতার জন্য অপরাধবোধের সচেতনতা, একজন ভগবানের বিরুদ্ধে পাপ করেছে এবং ক্রমাগত পাপ করে চলেছে, তার জন্য মন্দ বিবেক-বোধ। এই অপরাধবোধের অনুভূতি, যা ধর্মগুরুরা নিরবচ্ছিন্নভাবে জিইয়ে রেখেছিল এবং যা শীঘ্রই ধর্মীয় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার অন্য একটা ভাসা-ভাসা প্রেরণা ছিল, যা এই অনুভূতির আসল উৎসস্থলকে বুদ্ধি করে ঢেকে রেখেছিল। জাতির সামনে এসেছিল কঠিন সময়: ঈশ্বরের আনুকূল্যের ওপর নির্ভর-করা আশাগুলো পূরণ হতে দেরী হচ্ছিল; তারা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, এই অলীক বিশ্বাসের ওপর আর ভরসা রাখা সোজা ছিল না। যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতে চাইত, তাহলে, তারা যে পাপী, সেই অপরাধের সচেতনতা তাদের কাছে ঈশ্বরের অভিশাপের একটা অজুহাত বলে পরিগণিত হত। তারা ঈশ্বরের শাস্তি পাবার যোগ্য, কারণ তারা অনুশাসন মানে নি; এই অপরাধবোধের সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়োজন, যেটা তাদের অনেক গভীর থেকে উঠে আসে এবং তৃপ্তিহীন, তাদের ধর্মানুশাসনকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে তোলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো খেলো হয়ে পড়ে। নৈতিক কঠোরতার তপস্যার নতুন পরিবহনে, ইহুদিরা নিজেদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহজাত প্রবৃত্তি-দমন চাপিয়ে দেয় এবং তার ফলে, অন্ততঃ মতবাদ এবং অনুশাসনের দিক থেকে, এমন একটা নৈতিকতার উচ্চ মার্গে পৌঁছে যায় যেটা প্রাচীন কালের অন্যজাতিগুলোর কাছে অগম্য থেকে যায়। অনেক ইহুদিরাই এই ব্যাকুল বাসনাকে তাদের ধর্মের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় মহান প্রাপ্তি বলে মনে করে। আমাদের এই অনুসন্ধানে দেখাতে চাই যে, এটা প্রথমটার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, অর্থাৎ এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে। ঈশ্বরের প্রতি অবদমিত বৈরীতার জন্য অপরাধবোধের এই নৈতিকতার উৎসকে অস্বীকার করা যাবে না। এই বৈশিষ্ট্য এর রয়েছে যে, এটা কখনোই শেষ হয়নি এবং কখনোই শেষ হবে না, যে বৈশিষ্ট্য আমরা আসক্তি-সঞ্জাত স্নায়বিক পীড়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পেয়েছি এবং তার সঙ্গে পরিচিত।

এর আরো বিকাশ ইহুদি ধর্মকেও ছাপিয়ে যায়। প্রাচীন পিতা-চরিত্রকে ঘিরে যে নাটক হত, তার থেকে উদ্ভূত অন্যান্য উপাদানগুলোকে কোনোক্রমেই মোজেসের ধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। সেই যুগারম্ভে অপরাধ-সচেতনতা কেবলমাত্র ইহুদিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল একটা নাম-না জানা অস্বস্তির মতো, একটা দুর্ভাগ্যের পূর্ব-সঙ্কেতের মতো, যার কারণ কেউ জানত না। আধুনিক ইতিহাস প্রাচীন সংস্কৃতির বুড়িয়ে যাওয়ার কথা বলে। আমি অনুমান করি যে, জাতির মধ্যে যে হতাশা ছড়িয়ে ছিল, তার কিছু সাময়িক, উদ্দেশ্যহীন কারণ এই আধুনিক ইতিহাস বুঝেছিল। মানসিক চাপকে হালকা করাটা ইহুদিদের থেকেই শুরু হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন জায়গা থেকে নানারকম প্রস্তাবনাময় ইঙ্গিত দ্বারা ধারণাটিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তবুও একজন ইহুদির, টারসুস্-এর সওল, যাকে রোমান নাগরিক হিসাবে "পল" বলে ডাকা হত, মনেই এই বোধটার উদয় হয়: "যেহেতু আমরা আমাদের পিতা ঈশ্বরকে হত্যা করেছি, তাই আমরা এমন অসুখী।" এখন আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে কেন তিনি একটা সুখী সময়ের প্রবঞ্চিত বেশে এই সত্যকে ধরতে পেরেছিলেন : "আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষালন হয়ে গেছে, যেহেতু আমাদেরই একজন আমাদের সকলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তাঁর জীবন দিয়ে।" এই সূত্রটিতে অবশ্য ঈশ্বরকে হত্যা করার কথা উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত একটা আত্মোৎসর্গ দ্বারা হয়, তা হত্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আত্মোৎসর্গের বলি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, এই প্রতিশ্রুতি দ্বারাই প্রবঞ্চনা ও ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে যোগসূত্রটা স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক সত্যের উৎস থেকে এই নতুন বিশ্বাস যে শক্তি আহরণ করেছিল, তার দ্বারা সে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে সমর্থ হয়েছিল; নির্বাচিত জাতি হবার আনন্দঘন অনুভূতির জায়গায় নতুন একটা হাওয়া এল, মুক্তির মাধ্যমে। পিতৃ-হত্যার যে ঘটনা, তা মানুষের মনে ফিরে এসে যে সমস্ত প্রতিকূলতা একেশ্বরবাদের নির্যাসের মধ্যে ছিল, তার চেয়েও বেশি প্রতিকূলতা জয় করল; এটা আরও বেশি বিকৃতির মধ্যে দিয়ে গেল। যে অকথ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটার জায়গা একটা আদিম পাপ-এর অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মতবাদ অধিকার করল।

পল প্রতিষ্ঠিত এই নতুন ধর্মের ভিত্তি হল, আদিম পাপ এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত। যে ভ্রাতৃ সম্প্রদায় আদিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে কেউ নেতা ছিল কিনা, বা পিতৃ-হত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিল কিনা অথবা পরবর্তীকালে সেই চরিত্রটি কবিরা সৃষ্টি করেছিলেন কিনা, যারা নিজেদেরকে সেই নায়কের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন এবং তারপর ঐতিহ্যের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, এই প্রশ্ন অনুত্তরিত থেকে যাবে। খ্রিস্টিয় মতবাদ ইহুদি ধর্মের বাঁধ ভেঙে দেবার পরে, অন্য অনেক উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিল, খাঁটি একেশ্বরবাদের অনেক বৈশিষ্ট্যই বর্জন করেছিল এবং অন্যান্য ভূমধ্য অঞ্চলীয় জাতিদের আচারানুষ্ঠানের অনেক কিছু

গ্রহণ করেছিল। যেন ইজিপ্ট ইখনাতনের উত্তরাধিকারীদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। যেভাবে এই নতুন ধর্ম প্রাচীন পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যেকার যুগ্ম বিপরীত শক্তির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে নিয়েছিল, তা উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান মতবাদ হচ্ছে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, তার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করা; কিন্তু এই সম্বন্ধের অন্য দিকটা নিজেকে বিকশিত করে পুত্রের মধ্যে, যে অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেয়, পিতার পাশে নিজেও ঈশ্বর হয়ে যায়, এবং সত্য এই যে, পিতার জায়গায় নিজেকে বসায়। গোড়াতে এটা ছিল পিতার ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম শেষে পুত্রের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। সেই পিতাকে সরিয়ে দেওয়ার নিয়তি থেকে এ-ও রেহাই পেল না।

ইহুদি জাতির কেবল একটা অংশ নতুন ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করেছিল। যারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তাদের এখনও ইহুদি বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তারা বাকি পৃথিবীর থেকে, আগে যা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি আলাদা হয়ে গেল। নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়-এর কাছ থেকে তাদের তীব্র নিন্দা শুনতে হয়েছিল যে তারা ঈশ্বরকে হত্যা করেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল ইহুদিরা, ইজিপ্‌শিয়ানস, গ্রিক, সিরিয়ান, রোমান এবং শেষ পর্যন্ত টিউটন-রাও। এই নিন্দার পুরো ভাষাটা ছিল এইরকম : "ওরা স্বীকার করে না যে ওরা ঈশ্বরকে হত্যা করেছে, অথচ আমরা স্বীকার করি এবং সেই অপরাধ থেকে বিশোধিত হয়েছি।" তাহলে এটা বোঝা সহজ হয়ে গেল যে, এই নিন্দার পেছনে কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে। কেন ইহুদিরা ঈশ্বরকে হত্যা করার এই স্বীকারোক্তি যে অগ্রগতির পূর্বাভাস দিয়েছিল, (তার সমস্ত বিকৃতি সত্ত্বেও) তাতে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছিল, সেটা একটা বিশেষ তদন্তের বিষয়বস্তু হতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে তারা, বলতে গেলে, একটা দুঃখদায়ক অপরাধের বোঝা কাঁধে নিয়েছিল। তার জন্যে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

আমাদের গবেষণা বোধ হয় এই প্রশ্নের ওপর কিছুটা আলোকসম্পাত করতে পেরেছে যে, ইহুদিরা কেমন করে তাদের বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণগুলো অর্জন করেছিল। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কেমন করে একটা সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই সমস্যাটা সমাধান করা সহজ মনে হচ্ছে না। অবশ্য এরকম প্রহেলিকার যথার্থ উত্তর দাবী করা বা আশা করাও ঠিক নয়। আমি শুধু একটা সহজ অবদান রাখতে পারি, আমার পূর্বে উল্লিখিত চরম সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে যেটার যথার্থ মূল্যায়ন করা উচিত।

--০--

পৃথিবী বদলে দেয়া মহাগ্রন্থ

বাইবেল

একটি জীবনী

মূল : ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

পৃথিবীর প্রতি তিনজনের একজনের জন্য বাইবেল হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ-প্রদর্শক আর এই বাইবেল পৃথিবীর বৃহত্তম সুসংগঠিত ধর্ম, ক্রিশ্চিয়ানিটির একেবারে মর্মস্থলে অবস্থিত একটি অসামান্য গ্রন্থ। বাইবেল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত বই, যা গত দুশো বছরে অন্তত ছ'কোটি কপি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু বাইবেল একটা জটিল গ্রন্থ এবং এর ইতিহাসও অত্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বইয়ের বিষয়বস্তু বদলেছে, এটা বিভিন্ন অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে এই বই নানারকম অর্থ বহন করেছে। এই বইটিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং, একজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বইটির সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ধারণা, তার উদ্ভব, তার জীবন এবং পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা করেছেন। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় মৌখিক ইতিহাস লিখিত শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে, আর্মস্ট্রং তা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং কেমন করে এই সর্বব্যাপী শাস্ত্র একটি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, কেমনভাবে এটা ক্রিশ্চিয়ানিটির পবিত্র রচনা হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে– সেসবও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। যে সময়ে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং রচিত বাইবেল-এর জীবনী একটি অনবদ্য, মন-কাড়া-বই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর্মস্ট্রং কেবলমাত্র বাইবেল কেমন করে, কখন এবং কার দ্বারা লিখিত হয়েছিল, তাই বর্ণনা করেননি, তিনি দু'হাজার বছরের রবিব, বিশপ, পণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের দ্বারা বাইবেলের ব্যাখ্যাগুলিকেও পরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে বাইবেল-ব্যাখ্যার অসংখ্য নতুন নতুন দিক খুলে দিয়েছেন, কেবলমাত্র একটি মতই সঠিক, এরকম মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি অনুবাদ করেছেন সৌরীন নাগ